পাঠ সঞ্চয়ন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত অষ্টম শ্রেণীর
বাংলা সাহিত্য
T. B. No. 76/8/TB/22 dated 27. 12. 76

পাঠ সঞ্চয়ন

[অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য]

জগৎ লাহা, এম. এ.
অধ্যাপক, চন্দননগর গভঃ কলেজ
চন্দননগর, হুগলী

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

ভারত পাবলিশার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

17/2/92
No. 5181

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত

নূতন সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৮৫

891.44
JAG

S8
JAG

স্বাতী ভট্টাচার্য, ভারত পাবলিশার্স ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ কর্তৃক প্রকাশিত ও পরেশনাথ পান, ইন্দ্রলেখা প্রেস ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

১১৭৬ সাল—*বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* ... ১
মহাত্মা ডেভিড হেয়ার—*শিবনাথ শাস্ত্রী* ... ৯
কৈশোর স্মৃতি—*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* ... ১৬
তরুণের সাধনা—*নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস* ... ২২
সাইক্লোন—*শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* ... ২৮
গ্যালিলিও ও তাঁর আবিষ্কার—*সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর* ... ৩৬
জলসত্র—*বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়* ... ৪৩
বৃহত্তর ভারতে ভারতীয় সভ্যতা—
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৫২
সাহারা অভিযান—*প্রবোধ কুমার সান্যাল* ... ৫৮
প্রাচীন ভারতের কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য—
নীহাররঞ্জন রায় ... ৬৬
বাবা মা ও ছেলে—*বনফুল* ... ৭৩
স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়—
আশিষ নাহা ... ৮১
অপু দুর্গার জগৎ—*সুভাষ মুখোপাধ্যায়* ... ৯০

পদ্যাংশ

রাম ভরত মিলন—*কৃত্তিবাস ওঝা* ... ৯৭
পরীক্ষা—*কাশীরাম দাস* ... ১০২
শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা—*ভারতচন্দ্র রায়* ... ১০৬
ফুলকপি—*ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত* ... ১০৯
বীরবাহুর পতনে রাবণের বিলাপ—
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ... ১১১
কবির অন্ধদশা—*হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়* ... ১১৬

পলাশীর যুদ্ধ—নবীনচন্দ্র সেন ... ১২০
পূজারিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১২৫
ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ... ১৩১
বল বল বল সবে—অতুলপ্রসাদ সেন ... ১৩৪
মেথর—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ১৩৭
চোর-ডাকাত—নজরুল ইসলাম ... ১৪০
কৃষ্ণারজনী—কুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ১৪৪
তীর্থফল—কালিদাস রায় ... ১৪৮
হারানো টুপি—কাজী কাদের নওয়াজ ... ১৫১
এখানে আকাশ নীল—জীবনানন্দ দাস ... ১৫৫
রাণার—সুকান্ত ভট্টাচার্য ... ১৫৭

লেখক : বাংলা সাহিত্যের সর্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক—'সাহিত্য সম্রাট', প্রবন্ধ লেখক ও রম্যরচনাকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪)। যুগপৎ সাহিত্যসৃষ্টি ও সমালোচনা কাজে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—তিনি 'সব্যসাচী'। বাংলা গদ্য-সাহিত্য কি পরিমাণে যে সমৃদ্ধ করেছেন তা ভাবলে আমাদের বিস্মিত হ'তে হয়। কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, স তারাম, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল এঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত্র, কমলাকান্তের দপ্তর—আজ পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রবন্ধ ও রম্যরচনা গ্রন্থ। এঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সেকালে বাংলা ভাষার সেবায় বিরাট ও ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। চিন্তাশীলতা, মনীষা, দেশপ্রেম ও সৌন্দর্যবোধে গরীয়ান বঙ্কিম-সাহিত্য। তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত, উচ্চাঙ্গ স্টাইলের ভাষা-বৈভবেও তুলনারহিত। □

তাঁর লেখা : বর্তমান রচনাটি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ' থেকে সঙ্কলিত। এই 'আনন্দমঠ' সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় স্বদেশপ্রেমের উজ্জীবনী কাহিনী, আত্মত্যাগ ও আর্তসেবার আদর্শে সমুজ্জ্বল। আমাদের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেম তরম্' এই গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য পাঠ্য অংশটিতে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' এক নিখুঁত, অপূর্ব, মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে উঠেছে। □

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ-নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার,

হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা—তাহার বড় বড় ছাদওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্য-সমাগম শূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল; যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ—রাজস্ব আদায়ের কর্তা মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল—জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্—কিন্তু আজ ধনী নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাঁহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভার্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া, গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস-জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, “এরূপে কদিন চলিবে?”

কল্যাণী বলিল, "বড় অধিক দিন নয়। যত দিন চলে; আমি যতদিন পারি চালাই, তারপর তুমি মেয়েটি লইয়া সহরে যাইও।"

মহেন্দ্র। সহরে যদি যাইতে হয়, তবে তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই। চল না এখনই যাই।

পরে দুই জনে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল।

ক। সহরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে কি?

ম। সে স্থান হয়ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায়শূন্য হইয়াছে।

ক। মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এস্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্তব্য।

মহেন্দ্র বলিল, "এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ; ইহা যে সব চোরে লুঠিয়া লইবে।"

ক। লুঠিতে আসিলে আমরা কি দুইজনে রাখিতে পারিব? প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে? চল, এখনও বন্ধসন্ধ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি? বেহারা ত সব মরিয়া গিয়াছে, গোরু আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত গোরু নাই।"

ক। আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইহারা দুইজন বাঁচিবে।

পরদিন প্রভাতে দুইজনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটিকে কোলে লইয়া রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, "পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত লুঠেড়া ফিরিতেছে, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।" এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, "যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে

তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।” এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন, “তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে?”

কল্যাণী আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিনে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র,পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলি সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিল, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। মেয়েটি মহেন্দ্রের কোলে—এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়। একবার এক নিবিড় শ্যামলপত্ররঞ্জিত সুগন্ধকুসুমসংযুক্ত লতাবেষ্টিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুইজনে বিশ্রাম করিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্বল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হাতে, পায়ে, কপালে সিঞ্চন করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুই জনে ক্ষুধায় বড় কাতর হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটির ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য হয় না। অতএব আবার তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটীতে ত মনুষ্য নাই! বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ সকল পলাইয়াছে। মহেন্দ্র ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক হাঁক করিতে লাগিলেন।

কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, "একটু তুমি সাহস করিয়া একা থাক, দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব।" এই বলিয়া একটা মাটির কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. '১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল।'—১১৭৬ সাল কি নামে বিখ্যাত হয়ে আছে? ঐ সময়কার পদচিহ্ন গ্রামের যে অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক, তা নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখ।

২. 'বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।'—কবে, কেন 'বাঙ্গালায়' কান্নার কোলাহল পড়ে গিয়েছিল?

৩. 'লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল'—কেন? কোন্ সময়? তার পর লোকে আর কি কি করতে লাগল?

৪. 'অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে।'—লেখক কোন্ অবস্থার কথা বলেছেন? 'রমণীয় বপু' অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে কেন?

৫। 'পরে দুই জনে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল।' দুই জন কে কে? তাঁদের মধ্যে কেন তর্ক বিতর্ক হল? এর ফল কি হল?

৬. মহেন্দ্র কে? তাঁর স্ত্রী ও কন্যার নাম কি? মহেন্দ্র তাদের নিয়ে কোথায় চলেছেন, কেন চলেছেন? মহেন্দ্র সঙ্গে কি নিলেন, তাঁর স্ত্রী কল্যাণীই বা কি সঙ্গে নিলেন? কেন নিলেন?

৭. ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলাদেশে যে মন্বন্তর হয়েছিল তার কারণ কি? এই মন্বন্তরের মর্মস্পর্শী চিত্রটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর'। এই অংশটি কোন্ রচনা হতে গৃহীত হয়েছে? এর লেখক কে? কাদের সম্মুখে মন্বন্তর? এই মন্বন্তরের ফলে কি হয়েছিল?

২. 'যদি প্রাণে বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব ?'—কোন্ রচনার অন্তর্গত ? লেখক কে ? এই উক্তিটি কার ? তিনি কি বলতে চেয়েছেন ?

৩. 'কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইহারা দুই জন বাঁচিবে ?'—কোন্ রচনার অন্তর্গত ? লেখক কে ? কে, কাদের জন্য এবং কেন মনে মনে এইরূপ স্থির করলেন ?

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'আজ সব নীরব।' কে, কোথায়, কেন ? এই নীরবতার পরিচয় দাও।

২. 'অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে।' 'দম্পতিটির' পরিচয় দাও ? তাঁরা বসিয়া ভাবছেন কেন ? তাঁদের সম্পর্কে 'নিশীথফুল্লকুসুমবৎ' বিশেষণটি ব্যবহারের সার্থকতা কোথায় ?

৩. 'আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব।'—কে এইরূপ মনে করেছিলেন ? তিনি কে ? সরফরাজ কে ? 'এই সময়' বলতে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে ?

৪. 'সেই বহু পরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা।' তিনি কে ? তাঁর ভার্যা ও কন্যার নাম কি ?

৫. 'আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব'। 'আমি' কে ? তিনি কিজন্য হাতিয়ার নিতে চান ? তিনি কি হাতিয়ার নিয়ে এসেছিলেন ?

৬ 'শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, দুধ আনিব।' কে, কাকে, কখন এই কথাগুলি বলেছিলেন ? তিনি দুধ আনতে কোথায় গেছিলেন ?

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. শব্দার্থ লিখ : মৃন্ময়, স্নাতক, গোচারণে, শৈলশিখরবৎ, মনুষ্য-সমাগমশূন্য, মধ্যাহ্ন, নিশীথফুল্লকুসুমবৎ, দম্পতি, মহার্ঘ, পৈঁচা, দৌরাত্ম্য, বিমুখ, রাজস্ব, উপবাস, ইতর, অনাহার, প্রাদুর্ভাব, ব্যাধিগ্রস্ত, ভার্যা, স্বয়ং, গো-শাল, গো-দোহন, পুরুষানুক্রমে, হাতিয়ার, অগ্নিময়, শ্যামলপত্ররঞ্জিত, সুগন্ধসংযুক্ত, লতাবেষ্টিত, শ্রমসহিষ্ণুতা, সিঞ্চন, অগ্নিতরঙ্গ, পল্বল, সন্তরণ, চটী, শীতল, নিষ্ক্রান্ত।

২. বাক্য গঠন কর : রাজপথ, টোল, শব্দহীন, বিঘ্নময়, ছড়ওয়ালা, সম্মুখে, মহার্ঘ, এক সন্ধ্যা আহার, কড়ায় গণ্ডায়, দৌরাত্ম্য, বিমুখ, আধপেটা,

রোগাক্রান্ত, প্রাদুর্ভাব, নির্ধন, তর্ক-বিতর্ক, জনশূন্য, পুরুষানুক্রমে, গাড়োয়ান, উদ্দেশে, হাতিয়ার, অগ্নিময়, কর্দমময়, পল্বল, নিরীক্ষণ, লতাবেষ্টিত।

৩. পদ পরিবর্তন কর: উত্তাপ, প্রবল, নীরব, বৃহৎ, ক্রুদ্ধ, অভ্যন্তর, দম্পতি, মহার্ঘ, সন্ধ্যা, আরম্ভ, বিমুখ, উপবাস, বন্য প্রাদুর্ভাব, স্পর্শ, রমণীয়, চিন্তা, সহর, উপকার, সঞ্চিত, স্থির, ডাকাত, ক্ষুদ্র, শুষ্ক, সিঞ্চন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিরীক্ষণ, দুধ, নিক্রান্ত, স্নিগ্ধ।

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ কর: মৃন্ময়, সরোবর, অভ্যন্তর, মধ্যাহ্ন, মহার্ঘ, রোগাক্রান্ত, প্রাদুর্ভাব, নির্ধন, মন্বন্তর, পুরুষানুক্রমে, ইতস্ততঃ, নিরীক্ষণ, নিক্রান্ত, মহেন্দ্র।

৫. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর: গৃহময়, স্নাতক, অধ্যাপক, দৌরাত্ম্য, সন্ধ্যা, চৈত্র, কর্তব্য, দুর্গম, নিক্রান্ত, আহার, সহিষ্ণুতা, সংগ্রহ, জ্যৈষ্ঠ, দোকান-দার, চিকিৎসা।

৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: গৃহপ্রান্ত, রাজপথ, মনুষ্যসমাগম-শূন্য, শব্দহীন, দম্পতি, কৃষকপত্নী, রাজপুরুষ, আধপেটা রোগাক্রান্ত, অনাহার, দুঃখপূর্ণ, ব্যাধিগ্রস্ত, আত্মীয়স্বজন, উপায়শূন্য, প্রাণরক্ষা, প্রভাত, শ্যামলপত্ররঞ্জিত, অগ্নিতরঙ্গ।

৭. স্থূলাক্ষর পদের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর: **লোক** দেখি না। বর্ষাকালে বেশ **বৃষ্টি** হইল। **দেবতা** বুঝি কৃপা করিলেন। **রোগ** সময় পাইল। **প্রাণে** না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে? **বারুদ** লইয়া গেলেন। আমিও **হাতিয়ার** লইব। **ক্ষুধায়** বড় আকুল হইলেন।

৮. শূন্যস্থানে যথোপযুক্ত পদ ব্যবহার কর: তাহাদের — মন্বন্তর। রাজা রাজস্ব — — বুঝিয়া লইল। বাঙ্গালায় — কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল। আজ ধনী — এক দর। সহরে গেলে কিছু — উপকার হইবে কি? কন্যাটিকে কোলে লইয়া রাজধানীর — যাত্রা করিলেন। কলসী — পড়িয়া ছিল।

মহাত্মা ডেভিড হেয়ার
শিবনাথ শাস্ত্রী

লেখক ঃ পণ্ডিত মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯) উনবিংশ শতাব্দীর এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুর গ্রামে জন্ম। সেকালের অন্যতম প্রধান কবি, প্রবন্ধ লেখক, ঔপন্যাসিক এবং সমাজসংস্কারক। কিছুকাল 'সোমপ্রকাশ' ও 'সমদর্শী' পত্রিকা দুটি সম্পাদনা করেন। তাঁর লেখা 'আত্মচরিত' ও 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ দুটি বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। 'মহাত্মা ডেভিড হেয়ার' রচনাটি শেষোক্ত গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। শিবনাথ বেশ কয়েকখানি উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর লেখা যেমন তথ্যসমৃদ্ধ, তেমনি সাবলীল, নিরলংকৃত ও সুখপাঠ্য। ☐

তাঁর লেখা ঃ এই নিবন্ধটিতে একদিকে ভারত-বান্ধব এক বিদেশী ইংরেজের চরিত্র ও এদেশে শিক্ষাপ্রসারে তাঁর প্রয়াস ও অবদানের কথা বিবৃত হয়েছে, অন্যদিকে সেকালের সমাজজীবনের একটি সুন্দর পরিচয়ও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ☐

জয়গোপাল তর্কালংকার কলিকাতা শহরে একজন অগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরমোহন বিদ্যালংকার হেয়ারের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। একদিন গৌরমোহন বালক রামতনুকে চেতলা হইতে আনাইয়া সঙ্গে করিয়া গ্রে সাহেবের গঙ্গাতীরবর্তী ভবনে হেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। হেয়ারের গৃহে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাতে উমেদার ও স্কুলের বালকের অপ্রতুল হইত না। বালকগণ আসিলে হেয়ার তাহাদিগকে শুধু-মুখে যাইতে দিতেন না, পরিতোষপূর্বক মিঠাই খাওয়াইয়া ছাড়িতেন। তাঁহার ভবনের সন্নিকটে এক মিঠাই-ওয়ালার দোকান ছিল, তাহার সহিত হেয়ারের ঐ প্রকার বন্দোবস্ত ছিল।

বিদ্যালংকার বালক রামতনুকে সেই মিঠাই-ওয়ালার দোকানে বসাইয়া রাখিয়া হেয়ারের নিকট গেলেন ও তাঁহাকে ভর্তি করিবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন। হেয়ার এইরূপ অনুরোধ-উপরোধে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন স্বীয় স্বীয় বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য লোকের এমন ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল যে, হেয়ারের পক্ষে বাটীর বাহির হওয়া কঠিন হইয়াছিল। বাহির হইলেই দলে দলে বালক—'me poor boy, have pity on me, me take in your school' বলিয়া তাঁহার পালকির দু'ধারে ছুটিত। যে সময়ে বিদ্যালংকার বালক রামতনুকে লইয়া উপস্থিত হন, সে-সময়ে হেয়ার ফ্রি বালক লওয়া এক-প্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বিদ্যালংকারের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'খালি নাই, এখন লইতে পারি না।'

বিদ্যালংকার হেয়ারের নারী-সুলভ কোমল প্রকৃতি বিলক্ষণ বুঝিতেন। তিনি নিরাশ না হইয়া লাহিড়ী মহাশয়কে বলিয়া দিলেন, 'হেয়ারের পালকির সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ছুটিতে হইবে।' বালক রামতনু তাহাই করিতে লাগিলেন। তিনি হাতিবাগান বিদ্যালংকারের বাসা হইতে সকাল সকাল আহার করিয়া, কোনও দিন বা অনাহারে, হেয়ার বহির্গত হইবার পূর্বেই গ্রে সাহেবের ভবনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইতেন ও তাঁহার পালকির সঙ্গে ছুটিতে আরম্ভ করিতেন। হেয়ারের পালকি নানা-স্থানে যাইত, ও এক এক স্থানে অনেকক্ষণ বিলম্ব করিত। রামতনু সর্বত্রই যাইতেন ও অপেক্ষা করিতেন।

একদিন অপরাহ্নে হেয়ার স্বীয় ভবনে ফিরিয়া আসিয়া পালকি হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন বালকটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কি ক্ষুধা পাইয়াছে? কিছু আহার করিবে?' বালক রামতনু আহারের কথা শুনিয়াই ভয় পাইলেন। বিদেশীয় ও বিধর্মী লোকের ভবনে আহার করিলে পাছে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে বলিলেন, 'না, আমার ক্ষুধা পায় নাই।'

হেয়ার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমাকে সত্য বল। আমার বাটীতে তোমাকে খাইতে হইবে না, ওই মিঠাই-ওয়ালা তোমাকে খাইতে দিবে। সত্য করিয়া বল আজ আহার করিয়াছ কিনা?' তখন বালক রামতনু কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'আজ আমার খাওয়া হয় নাই।' তখন মহামতি হেয়ার মিঠাই-ওয়ালাকে পেট ভরিয়া মিঠাই খাইতে দিতে বলিলেন।

এইরূপে প্রায় দুই মাসেরও অধিক কাল গত হইল। শেষে হেয়ার তাঁহাকে ফ্রি বালকদের দলে লইতে স্বীকৃত হইলেন। স্কুলের বালকদিগের পরিচ্ছন্নতার দিকে হেয়ারের অতিশয় দৃষ্টি ছিল। বালকগণ যেরূপ অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আসিত তাহা দেখিয়া তিনি ক্লেশ পাইতেন। তিনি গামছা হস্তে স্কুলের দ্বারে দাঁড়াইতেন এবং সর্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন বালকদিগকে ধরিয়া তিরস্কার-পূর্বক মায়ের মত উত্তম-রূপে গা মুছিয়া দিতেন। রামতনু স্কুল-সোসাইটির স্থাপিত স্কুলে ফ্রি বালকরূপে ভর্তি হইলেন। ওই স্কুল পরে 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল' ও তৎপরে 'হেয়ার স্কুল' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থানে মহাত্মা হেয়ারের জীবন-চরিত কিছু বলা আবশ্যক।

হেয়ার ১৭৭৫ সালে স্কটল্যাণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০০ সালে ঘড়ি-ওয়ালার কাজ লইয়া এদেশে আগমন করেন। এখানে বাস-কালে এই কর্মসূত্রে এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়। হেয়ার নিজে উচ্চদরের শিক্ষিত লোক ছিলেন না, কিন্তু ইহা অনুভব করিয়াছিলেন, যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত না হইলে এ-দেশের লোকের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে না। ১৮১৪ সালে রামমোহন রায় যখন কলিকাতাতে অবস্থিত হইলেন, তখন অল্পকালের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে মিত্রতা জন্মিল। দুই বন্ধুতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত করিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হইল। অবশেষে স্থির হইল যে এদেশীয় বালকগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করা হইবে। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীন্তন

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর হাইড ঈস্ট মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে হেয়ার তাহার কমিটির একজন সভ্য নিযুক্ত হইলেন।

১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি দিবসে হিন্দু কলেজ খোলা হয়। সেই বৎসরই হেয়ারের প্রধান উদ্যোগে ও তৎকালীন ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে 'স্কুল-বুক সোসাইটি' নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। ওই সভার সভ্যগণ ছাত্রগণের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও বাংলা নানাপ্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামমোহন রায় তাঁহার বন্ধু হেয়ারের সহায় হইয়া নূতন ধরনের স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একখানি বাংলা ব্যাকরণ ও 'জ্যাগ্রাফি' নাম দিয়া একখানি ভূগোল-বিবরণ লিখিয়াছিলেন।

১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হেয়ারের উদ্যোগে 'স্কুল সোসাইটি' নামে আর একটি সভা স্থাপিত হইল। হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব তাহার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিলেন। কলিকাতার স্থানে স্থানে নূতন প্রণালীতে ইংরাজী ও বাংলা শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করা এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল। হেয়ার ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এমন কি সেজন্য তাঁহার ঘড়ির ব্যবসায় রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি গ্রে নামে তাঁহার এক বন্ধুকে ঘড়ির কারবার বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থে শহরের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয়পূর্বক তদুৎপন্ন আয় দ্বারা নিজের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন ; এবং অনন্য-কর্মা হইয়া এদেশের বালকদের শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত হইলেন। ঠনঠনিয়া, কালীতলা, আড়পুলি প্রভৃতি কতিপয় স্থানে তিনি কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। প্রতিদিন প্রাতে আহার করিয়া, একখানি পালকিতে আরোহণ-পূর্বক, তিনি স্বীয় নামে প্রসিদ্ধ বর্তমান হেয়ার স্ট্রীট হইতে বাহির হইতেন।

প্রথমে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা ও স্কুলগুলি পরিদর্শন

করিতেন। তৎপরে যে-সকল দরিদ্র বালকের পীড়ার সংবাদ পাইতেন, তাহাদের ভবনে গিয়া তাহাদের ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন। অবশেষে হিন্দু কলেজে গিয়া উপস্থিত হইতেন। সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর, বলিতে কি প্রত্যেক বালকের কার্য পরিদর্শন করিতেন। এইরূপে সমস্ত দিন শহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; সায়ংকালে বাসভবনে ফিরিয়া যাইতেন। স্কুলের বালকদের প্রতি হেয়ারের যে কি প্রেম ছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। তাহাদিগকে দেখিলে তাঁহার এত আনন্দ হইত যে, তিনি আর সকল কাজ ভুলিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে স্কুলে আসিবার সময়ে নিম্নশ্রেণীর শিশুদিগের জন্য খেলিবার বল কিনিয়া আনিতেন। স্কুলের ছুটি হইলে ওই বল ঊর্ধ্বে ধরিয়া উদ্বাহু হইয়া শিশুদের মধ্যে দাঁড়াইতেন। তাহারা চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত। কেহ কোমড় জড়াইত; কেহ গাত্র বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিত; কেহ বা স্কন্ধে ঝুলিত। তিনি তাহাতে মহা আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার ফ্রি বালকগুলির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে নিজ সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। রামতনুকে তিনি সেই শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন এবং চিরদিন তাঁহাকে সেইভাবে দেখিতেন।

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনাটি অনুসরণ করে 'এদেশে শিক্ষাপ্রসারে ডেভিড হেয়ারের অবদান' বিষয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ রচনা কর।

২. হেয়ারের সঙ্গে সেকালের শিক্ষার্থী বালকদের সম্পর্ক কি রকম ছিল, গুছিয়ে লিখ। হেয়ারের চরিত্রের কোন্ মানবিক গুণগুলি তোমার মন আকৃষ্ট করে তা বিবৃত কর।

৩. 'বিদ্যালংকার হেয়ারের নারী-সুলভ কোমল প্রকৃতি বিলক্ষণ বুঝিতেন।'—বিদ্যালংকার কে? 'হেয়ারের নারী-সুলভ কোমল প্রকৃতি' বলতে

কি বুঝানো হয়েছে? তাঁর নারী-সুলভ প্রকৃতির সমর্থনে একটি ঘটনা বিবৃত কর।

৪. রামতনু কে? তিনি স্কুল-সোসাইটির স্থাপিত স্কুলে ফ্রি বালকরূপে কিভাবে ভর্তি হয়েছিলেন?

৫. 'মহাত্মা হেয়ারের জীবন-চরিত কিছু বলা আবশ্যক।'—লেখক শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুসরণে হেয়ারের জীবন-চরিত সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৬ 'স্কুলের বালকদের প্রতি হেয়ারের যে কি প্রেম ছিল তাহা বর্ণনীয় নহে।'—হেয়ারের এই প্রেমের যথাযোগ্য পরিচয় দাও।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত না হইলে, এদেশের লোকের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে না।'—কোন্ রচনা হতে অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে? উহার লেখক কে? কার মনোভাব এখানে বর্ণিত হয়েছে? তাঁর এই মনোভাব বিশ্লেষণ কর।

২. 'তাঁহার ফ্রি বালকগুলির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে নিজ সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন।'—কোন্ রচনার অন্তর্গত? লেখক কে? 'ফ্রি বালকগুলি' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে? তিনি তাদের যে 'নিজ সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন' তার পরিচয় দাও।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. হেয়ারের গৃহে প্রতিদিন যে সকল শিক্ষার্থী বালক ভর্তির জন্য আসত তাদের জন্য হেয়ার কি ব্যবস্থা করেছিলেন?

২. 'me poor boy. have pity on me, me take in your school'—একথা কারা, কখন, কেন বলত?

৩. 'না, আমার ক্ষুধা পায় নাই।'—একথা কে, কাকে বলেছিলেন? কেন এমন কথা বলেছিলেন?

৪. 'আজ আমার খাওয়া হয় নাই।'—বক্তা কখন একথা বলেছিলেন? তখন হেয়ার কি করেছিলেন?

৫. হেয়ারের স্কুলের বালকদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি যে অতিশয় দৃষ্টি ছিল, তার কি দৃষ্টান্ত দিতে পারো?

৬. হেয়ারের বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর এবং তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭. এঁদের সম্পর্কে কি জানো, লিখ : রাধাকান্ত দেব, রামমোহন রায়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামতনু লাহিড়ী।

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. শব্দার্থ লিখ : অগ্রগণ্য প্রিয়পাত্র, উমেদার, অপ্রতুল, পরিতোষপূর্বক, বন্দোবস্ত, সাধ্য-সাধনা, অনুরোধ-উপরোধ, উত্যক্ত, ব্যগ্রতা, বাটী, বিলক্ষণ, বিধর্মী, জাতিচ্যুত, মহামতি, তিরস্কার-পূর্বক, কর্মসূত্রে, পরিবর্তন, তদানীন্তন, সম্পাদক, তদুৎপন্ন, কতিপয়, আরোহণ-পূর্বক, সায়ংকালে, উদ্বাহ হইয়া, শ্রেণীভুক্ত।

২. বাক্য গঠন কর : অপ্রতুল, বন্দোবস্ত, উত্যক্ত, সাধ্য-সাধনা, অনুরোধ-উপরোধ দলে দলে, এক-প্রকার, অবতরণ, আরোহণ-পূর্বক, জাতিচ্যুত, অতিশয়, ক্লেশ, সর্বাপেক্ষা, বন্ধুতা মিত্রতা, প্রবৃত্ত, বিবরণ, উদ্যোগ কিঞ্চিৎ, বাসভবন, সায়ংকাল।

৩. পদ পরিবর্তন কর : পণ্ডিত উমেদার, অপ্রতুল, পরিতোষ, দোকান, ব্যগ্রতা, কঠিন, উপস্থিত, কোমল, অনুরোধ, বিলম্ব, অপেক্ষা, বিদেশীয়, অধিক, স্বীকৃতি, অতিশয়, ক্লেশ, অপরিচ্ছন্ন, প্রসিদ্ধ বন্ধুতা, স্থাপন, প্রতিষ্ঠিত, নিযুক্ত, প্রবৃত্ত, প্রণয়ন, উদ্দেশ্য, নির্বাহ, পরিদর্শন, বর্ণনীয় অনুভব, জ্ঞান।

৪. বিপরীতার্থক শব্দ লিখ : অগ্রগণ্য, অপ্রতুল, কঠিন, ব্যগ্রতা, খালি, বহির্গত, অবতরণ, অধিক, অতিশয়, তিরস্কার, আগমন, বন্ধুতা/মিত্রতা, প্রয়োজনীয়তা, উপস্থিত, প্রবৃত্ত কিঞ্চিৎ, বর্ণনীয়।

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ কর : ভ্রাতুষ্পুত্র, বিদ্যালংকার, স্বীয়, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন, সর্বাপেক্ষা, তিরস্কার, ভবন, পাঠোপযোগী, কিঞ্চিৎ, পথ্যাদ, প্রত্যেক।

৬ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : ভ্রাতুষ্পুত্র, অনুরোধ-উপরোধ, বিদ্যালংকার, অনাহার, জাতিচ্যুত, মহামতি, সর্বাপেক্ষা, অপরিচ্ছন্ন, উচ্চদর, মহোদয়, ভদ্রলোক, তদুৎপন্ন, শিক্ষাদান, সায়ংকাল।

৭. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর : মিঠাই, মিঠাই-ওয়ালা, স্বীয়, ব্যগ্রতা, উপস্থিত, বহির্গত, আহার, দৃষ্টি, বন্ধুতা, প্রয়োজনীয়তা, এদেশীয়, প্রতিষ্ঠিত প্রবৃত্ত, বর্ণনীয়, ব্যাকরণ, স্থাপন, পরিদর্শন, সন্তান, জ্ঞান।

৮. শুদ্ধ বানান নির্দেশ কর : ভ্রাতুষ্পুত্র/ভ্রাতুস্পুত্র, সাক্ষাৎ সাক্ষাত, উত্যক্ত /উত্ত্যাক্ত, ব্যাগ্রতা / ব্যগ্রতা, বহিগত / বহির্গত, বিধর্মী / বিধর্মা, অপরিষ্কার/ অপরিস্কার, তিরষ্কার / তিরস্কার, পোষণ / পোষন, উর্ধ / ঊর্ধ্ব।

কৈশোর স্মৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক : কলকাতার জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথ। কৈশোর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে সাহিত্যসাধনা করে গেছেন। সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, সমালোচনা, সাহিত্য, পত্র—সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি সোনার ফসল ফলিয়েছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দান করেছিলেন জগৎজোড়া প্রতিষ্ঠা। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। এশিয়াবাসীর পক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হন। বারংবার সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন কবি। গোটা বিশ্বই ছিল যেন তাঁর ঘরবাড়ি। কবি, লেখক, মনীষী, চিন্তাবিদ্, দার্শনিক, মানবপ্রেমিক, কর্মযোগীরূপে আজো তিনি সুপরিচিত। শিক্ষানুরাগী শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথের সাংগঠনিক প্রতিভা ও কর্মৈষণার স্বাক্ষর বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন। এখন বিশ্বভারতী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। []

তাঁর লেখা : রবীন্দ্রনাথ আত্মচরিতমূলক দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থ দুখানির নাম 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'। এই দুখানি গ্রন্থে কবির শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের অনেক অভিজ্ঞতা এবং তাঁর ধীরে-ধীরে বড়ো-হয়ে-ওঠার ধারাবাহিক পরিচয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'জীবনস্মৃতি' সাধু গদ্যে এবং 'ছেলেবেলা' খুব সহজ সাবলীল চলতি গদ্যে রচিত। 'কৈশোরস্মৃতি' তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সেকালের অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অনেকের—যেমন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাদম্বরী দেবী (বউঠাকরুন) প্রভৃতির প্রভাব পড়েছিল। এই রচনাংশে তাঁদের পরিচয়, সেইসঙ্গে সেকালের কলকাতা এবং ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের অনেক কথা বিবৃত হয়েছে অত্যন্ত স্বাদু ও সাবলীল ভাষায়। []

ছাদের রাজ্যে নতুন হাওয়া বইল, নামল নতুন ঋতু।

তখন পিতৃদেব জোড়াসাঁকোয় বাস ছেড়েছিলেন। জ্যোতিদাদা

এসে বসলেন বাইরের তেতলার ঘরে। আমি একটু জায়গা নিলুম তারই একটি কোণে।

অন্দরমহলের পর্দা রইল না। আজ এ কথা নতুন ঠেকবে না, কিন্তু তখন এত নতুন ছিল যে মেপে দেখলে তার থই পাওয়া যায় না। তারও অনেক কাল আগে, আমি তখন শিশু, মেজদাদা সিভিলিয়ান হয়ে দেশে ফিরেছেন। বোম্বাইয়ে প্রথম তাঁর কাজে যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকেদের অবাক করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বউঠাকরুণকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়ির বউকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই তো ছিল যথেষ্ট, তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই—এ যে হল বিষম বেদস্তুর। আপন লোকেদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

বাইরের বেরোবার মতো কাপড় তখনো মেয়েদের মধ্যে চলতি হয়নি। এখন শাড়ি জামা নিয়ে যে সাজের চলন হয়েছে, তারই প্রথম শুরু করেছিলেন বউঠাকরুণ।

বেণী দুলিয়ে তখনো ফ্রক ধরেনি ছোটো মেয়েরা—অন্তত আমাদের বাড়িতে। ছোটোদের মধ্যে চলন ছিল পেশোয়াজের। বেথুন ইস্কুল যখন প্রথম খোলা হল, আমার বড়দিদির ছিল অল্পবয়স। সেখানে মেয়েদের পড়াশোনার পথ সহজ করবার প্রথম দলের ছিলেন তিনি। ধব্‌ধবে তাঁর রঙ। এদেশে তার তুলনা পাওয়া যেত না। শুনেছি পাল্কিতে ক'রে স্কুলে যাবার সময় পেশোয়াজ-পরা তাঁকে চুরি-করা ইংরেজ মেয়ে মনে করে পুলিসে একবার ধরেছিল।

আগেই বলেছি সেকালে বড়ো-ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না। কিন্তু এই সকল পুরোনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোটো। বয়সের এত দূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম, এই আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য এই যে, তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি ব'লে কখনো আমার মুখ চাপা দেন নি। তাই কোনো কথা ভাবতে

আমার সাহসে অকুলোন হয়নি। আজ ছেলেদের মধ্যেই আমার বাস। পাঁচরকম কথা পাড়ি, দেখি তাদের মুখ বোজা। জিজ্ঞেসা করতে এদের বাধে। বুঝতে পারি এরা সব সেই বুড়োদের কালের ছেলে যেকালে বড়োরা কইত কথা আর ছোটোরা থাকত বোবা। জিজ্ঞাসা করবার সাহস নতুন কালের ছেলেদের ; আর বুড়ো-কালের ছেলেরা সব-কিছু মেনে নেয় ঘাড় গুঁজে।

ছাদের ঘরে এল পিয়ানো। আর এল একালের বার্নিশকরা বউ-বাজারের আসবাব। বুকের ছাতি উঠল ফুলে। গরিবের চোখে দেখা দিল হাল আমলের সস্তা আমিরি।

এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম্ সুর তৈরি করে যেতেন ; আমাকে রাখতেন পাশে। তখনই-তখনই সেই ছুটে চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।

দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে-মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক-গ্লাস বরফ-দেওয়া জল, আর বাটাতে ছাঁচিপান।

বউঠাকরুণ গা ধুয়ে, চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর জড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা ; বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনো তা ফিরিয়ে নেন নি। সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে-ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু হু ক'রে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভ'রে।

ছাদটাকে বউঠাকরুণ একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিল্‌পের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ ; আশেপাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলনচাঁপা। ছাদ জখমের কথা মনেই আনেন নি, সবাই ছিলেন খেয়ালি।

প্রায় আসতেন অক্ষয় চৌধুরী। তাঁর গলায় সুর ছিল না সে কথা

তিনিও জানতেন, অন্যেরা আরো বেশি জানত। কিন্তু তাঁর গাওয়ার জেদ কিছুতে থামত না। বিশেষ ক'রে বেহাগ রাগিণীতে ছিল তাঁর শখ। চোখ বুজে গাইতেন, যারা শুনত তাদের মুখের ভাব দেখতে পেতেন না। হাতের কাছে আওয়াজ-ওয়ালা কিছু পেলেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে পটাপট শব্দে তাকেই বায়া-তবলার বদলি করে নিতেন। মলাট-বাঁধানো বই থাকলে ভালোই চলত। ভাবে ভোর মানুষ; তাঁর ছুটির দিনের সঙ্গে কাজের দিনের তফাত বোঝা যেত না।

সন্ধেবেলায় সভা যেত ভেঙে। আমি চিরকাল ছিলুম রাত-জাগিয়ে ছেলে। সকলে শুতে যেত, আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম ব্রহ্মদত্তির চেলা। সমস্ত পাড়া চুপচাপ। চাঁদনি রাতে ছাদের উপর সারি সারি গাছের ছায়া যেন স্বপ্নের আল্‌পনা। ছাদের বাইরে সিসু গাছের মাথাটা বাতাসে দুলে উঠছে, ঝিল মিল্‌ করছে পাতাগুলো। জানি নে কেন সবচেয়ে চোখে পড়ত সামনের গলির ঘুমন্ত বাড়ির ছাদে একটা ঢালু পিঠ-ওয়ালা বেঁটে চিলেকোঠা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিসের দিকে যেন আঙুল বাড়িয়ে রয়েছে।

রাত একটা হয়, দুটো হয়। সামনের বড়ো রাস্তায় রব ওঠে—

'বল হরি! হরিবোল।'

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'ছাদের রাজ্যে নতুন হাওয়া বইল, নামল নতুন ঋতু।'—'নতুন হাওয়া' এবং 'নতুন ঋতু' বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝাতে চেয়েছেন? কে তা ঘটালেন? কিভাবে তা ঘটল?

২ 'আগেই বলেছি সেকালে বড়ো-ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না।'—'সাঁকো' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন? সেকালে বড়ো-ছোটোর সম্পর্ক কি রকম ছিল?

৩ 'জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে।'—জ্যোতিদাদা কে? 'নির্জলা নতুন মন' বলতে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন? তাঁর সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কিরকম ছিল?

৪. ‘এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা।’ ‘আমার’—কার? কিভাবে তাঁর গানের ফোয়ারা ছুটেছিল?

৫. বউঠাকরুণ কে? তিনি ‘ছাদের রাজ্যে’ ‘দিনের শেষে’ কি ভাবে হাজির হতেন? তিনি কিভাবে ছাদটাকে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন?

৬. ‘প্রায় আসতেন অক্ষয় চৌধুরী।’—অক্ষয় চৌধুরী কে? তিনি আসরে বসে কি করতেন? তাঁর চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি মন্তব্য করেছেন?

৭. ‘সন্ধ্যেবেলায় সভা যেত ভেঙে।’—কিসের সভা? তারপর রবীন্দ্রনাথ কি করতেন?

● **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী**

১. ‘অন্দরমহলের পর্দা রইল না।’—কোন্ রচনার অংশ? লেখক কে? তিনি এই কথাগুলোর সাহায্যে কি বোঝাতে চেয়েছেন?

২. ‘জিজ্ঞাসা করবার সাহস নতুন কালের ছেলেদের; আর বুড়ো কালের ছেলেরা সবকিছু মেনে নেয় ঘাড় গুঁজে।’—কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অংশ এটি? তিনি নতুন কাল ও বুড়ো-কালের ছেলেদের সম্পর্কে কি বলতে চেয়েছেন?

৩. ‘গরিবের চোখে দেখা দিল হাল-আমলের সস্তা আমিরি।’—কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অংশ এটি? এই কথাগুলোর ভেতর দিয়ে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন?

৪. ‘সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভ'রে’—কোন্ লেখকের লেখা এটি? লেখাটির নাম কি? তিনি কোন্ প্রসঙ্গে এই কথাগুলো বলেছেন? এগুলোর সহজ অর্থ কি?

৫. ‘ছাদ-জখমের কথা মনেই আনেন নি, সবাই ছিলেন খেয়ালি।’—কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে এটি গৃহীত হয়েছে? কোন্ প্রসঙ্গে লেখক এই মন্তব্য করেছেন? লেখকের বক্তব্য কি?

● **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী**

১. ‘আমি একটু জায়গা নিলুম তারই একটি কোণে।’—‘আমি’ কে? কোথায় তিনি জায়গা নিলেন? সেই জায়গাটি কেমন?

২. ‘আপন লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।’—‘আপন লোকদের’

বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে ? কেন এবং কিভাবে তাঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল ?

৩. 'এখন শাড়ি জামা নিয়ে যে সাজের চলন হয়েছে, তারই প্রথম শুরু করেছিলেন বউঠাকরুণ।'—এই বউঠাকরুণ কে ? তিনি কোন্ সাজের চলন শুরু করেছিলেন ?

৪. 'শুনেছি পাল্কিতে করে স্কুলে যাবার সময় পেশোয়াজ-পরা তাঁকে চুরি-করা ইংরেজ মেয়ে মনে করে পুলিসে একবার ধরেছিল।'—'তাঁকে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে ? কোন্ স্কুলের কথা বলা হয়েছে ? পুলিস তাঁকে ধরেছিল কেন ?

৫. 'বয়সের এত দূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম, এই আশ্চর্য।' কার কথা বলেছেন লেখক ? তিনি কেমন প্রকৃতির লোক ছিলেন ?

৬. 'আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম ব্রহ্মদত্তির চেলা।'—'ব্রহ্মদত্তি' কি ? লেখক নিজেকে ব্রহ্মদত্তির চেলা বলেছেন কেন ?

● **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. বাক্যগঠন কর : ঢাকাঢাকি, আকাশ ভেঙে পড়া, ধবধবে, নির্জলা, অকুলোন, কথা পাড়া, বুকের ছাতি ফুলে ওঠা, হু হু করা, জেদ, ঢালু-পিঠওয়ালা।

২. পদপরিবর্তন কর : ঘর, শিশু, অল্পবয়স, সহজ, জ্যাঠামি, জিজ্ঞাসা, গরিব, আমিরি, সুর, বিধাতা, দক্ষিণে, জেদ।

৩. সন্ধিবিচ্ছেদ কর : যথেষ্ট, নির্জলা, চলাচল, আশ্চর্য।

৪. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর : ঢাকাঢাকি, চলতি, চলন, খেয়ালি, আমিরি, চাঁদনি, পিঠওয়ালা।

৫. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : অন্দরমহল, বেদস্তর, চলাচল, গোড়ে-মালা, নির্জলা, চিলেকোঠা।

৬. স্থূলাক্ষর চিহ্নিত পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : ছাদের ঘরে এল **পিয়ানো**। ছড়িয়ে যেত আমার **গান**। **সন্ধ্যেবেলায়** সভা যেত ভেঙে। শুনেছি **পাল্কিতে** করে স্কুলে যাবার সময়···। আমি ধরতুম চড়া সুরের **গান**।

৭. শূন্যস্থান পূরণ কর : এ যে হল — বেদস্তর। বেণী — তখনো ফ্রক ধরেনি ছোটো মেয়েরা। পাঁচরকম কথা —, দেখি তাদের মুখ —। কিন্তু তাঁর গাবার — কিছুতে থামত না।

S.C.E.R.T., West Bengal Library
S.C.E.R.T. West Bengal
Date 17/2/92

তরুণের সাধনা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস

লেখক : ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী নেতা, মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী উড়িষ্যার কটক শহরে। শৈশব থেকেই অসম্ভব মেধাবী এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত। কলকাতায় কলেজী শিক্ষা শেষ করে সুভাষ বিলাতে যান এবং সেখানে আই. সি. এস. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে স্বদেশে ফেরেন। অতঃপর পরাধীন দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার অদম্য অনুপ্রেরণায় সরকারী চাকরির মোহ ত্যাগ করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শিষ্যরূপে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতার মেয়র, কংগ্রেসের সভাপতি প্রভৃতি পদে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে ক্রমশই সারা ভারতের জনপ্রিয় দেশনেতার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হন। স্বদেশের কাজে বারংবার কারারুদ্ধ হন। এরপর স্বগৃহে অন্তরীণ হন এবং ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করে প্রথমে কাবুলে, পরে জার্মানী ও জাপানে যান। জাপানে প্রবাসী ভারতীয়দের সহায়তায় তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন এবং ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; মণিপুরের ইম্ফল আক্রমণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাপান সময়মতো সাহায্য না-করায় যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। সুভাষ দেশত্যাগ করেন। শোনা যায়, তিনি জাপানে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু দেশবাসী একথা আজো বিশ্বাস করে না। দেশবাসীর চোখে তিনি চির-অমর। []

তাঁর লেখা : নেতাজী সুভাষ সংগ্রামী দেশনায়ক, কর্মযোগী। কাজেই নিরুপদ্রবে ও নিশ্চিন্তে সাহিত্য-সাধনা করার সময় তিনি পাননি। তাঁর রচনা তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার। রাজনীতি বিষয়ে তিনি বেশকিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছিলেন কর্মসাধনার ফাঁকে ফাঁকে। সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল; তার মধ্যে 'ভারত পথিক', 'তরুণের স্বপ্ন',

'ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রচনায় সুভাষ আবেগদীপ্ত বুদ্ধিশাণিত উজ্জ্বল ভাষায় তরুণসমাজের কর্তব্য সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তা আজকালকার তরুণদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। []

দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। এই সাধনার আরম্ভ ছাত্রজীবনেই হওয়া উচিত। দান করিবার মত সম্পদ, অর্জন ও সঞ্চয় করিতে হইবে ছাত্রজীবনেই। শরীরে যাহার বল আছে, মনে যাহার সাহস ও তেজ আছে, শিক্ষা-দীক্ষা যে পাইয়াছে, ব্রহ্মচর্য সাধনে যে ব্রতী হইয়াছে সে ব্যক্তির দিবার মত সম্বল আছে। যে ভিক্ষুক, যে নিতান্ত দীনহীন, তাহার দানের কোন অর্থ নাই। সে নিজেই কৃপার পাত্র। ছাত্রজীবনে শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে হইবে ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে এবং জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে; এক কথায় শরীর, মন ও হৃদয় এই তিন দিক দিয়া জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইবে।

দেশসেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা যদি ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে পরীক্ষা পাশ ও স্বর্ণপদক লাভের মূল্য যে কতটা তাহা আপনারা সহজে অনুমান করিতে পারেন। আজ-কাল স্কুল ও কলেজে 'ভাল ছেলে' নামে এক শ্রেণীর জীব দেখিতে পাওয়া যায়; আমি তাহাদিগকে কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকি। তাহারা গ্রন্থকীট—পুঁথির বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই এবং পরীক্ষার প্রাঙ্গণে তাহাদের জীবন পর্যবসিত হয়। ইহাদের সহিত তুলনা করুন—'বকাটে' রবার্ট ক্লাইভকে। এই 'বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো' ছেলে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া অজানার সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে ইংরাজ জাতির জন্য সাম্রাজ্য জয় করে। ইংলণ্ডের ভাল ছেলেরা যাহা করিতে পারে নাই; করিতে পারিত না, তাহা সম্পন্ন করিল 'বকাটে' রবার্ট ক্লাইভ। ইংরাজ জাতি মনুষ্যত্বের মর্যাদা রাখিতে জানে, তাই তাহারা সর্বোচ্চ সম্মান ক্লাইভকে কৃতজ্ঞচিত্তে অর্পণ করিল। 'বকাটে' রবার্ট হইল শেষ জীবনে লর্ড ক্লাইভ।

ইংরাজ তথা—পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতি যত দিক দিয়া যত উন্নতি করিয়াছে তাহার কারণ যদি বিশ্লেষণ করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে তাহাদের দুইটি অপূর্ব গুণ আছে, যাহার বলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। প্রথমতঃ, তাহারা আপন দেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে এবং দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের Spirit of Adventure আছে। নূতনের আকর্ষণে তাহারা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিতে পারে। বাহিরের টানে তাহারা ঘর ছাড়িতে পারে ; সংসারের আকর্ষণে তাহারা চিরাচরিত রীতি ও প্রথা বর্জন করিতে পারে। এই নির্ভীকতা, গতিশীলতা ও 'সুদূরের পিয়াস' আছে বলিয়াই ইংরাজ আজ এত উন্নত ; ইহার অভাবে আমরা আজ এত দীন, হীন ও পঙ্গু।

কিন্তু চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ছিল না। আমরাও একদিন উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়া দেশদেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি, জ্ঞানালোক বিকিরণ করিয়াছি এবং শিল্প-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছি। সে ছিল আমাদের সম্প্রসারণের যুগ, আত্মসুপ্তির যুগ, পতনের যুগ। আজকাল আবার জীবনের স্পন্দন আমরা অনুভব করিতেছি। পতনের পর আবার উত্থান আরম্ভ হইয়াছে, তাই সুপ্তিভঙ্গের ও নব জাগরণের সমস্ত লক্ষণ চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, বাহির হইতে জ্ঞান ও সম্পদ আহরণের জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে সম্পদ যাহা কিছু আছে বিশ্বদরবারে নিবেদন করিবার জন্য আমরা পাগল হইয়াছি। তাই কবি গাহিয়াছিলেন—

আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান।

ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়া ভারতবাসী আমরা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা কোনও বিষয়ে নিকৃষ্ট নহি ; বরং আমরা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের বর্তমান দুর্দশা সত্ত্বেও আমাদের কবি, আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের বৈজ্ঞানিক, আমাদের কর্মী, আমাদের বণিক, আমাদের যোদ্ধা, আমাদের খেলোয়াড়, আমাদের কুস্তিগীর পালোয়ান—পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমরা বারবার আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'তরুণের সাধনা' রচনায় তরুণদের উদ্দেশ্যে নেতাজী সুভাষ যে বক্তব্য রেখেছেন, তা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।

২. 'ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত'—কাদের উদ্দেশ্যে লেখক এই নির্দেশ দিয়েছেন ? 'একমাত্র সাধনা' কি বুঝিয়ে লেখো।

৩. "আজকাল স্কুলে ও কলেজে 'ভালো ছেলে' নামে এক শ্রেণীর জীব দেখিতে পাওয়া যায় ; আমি তাহাদিগকে কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকি।"—

'ভালো ছেলে' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন ? তাদের 'এক শ্রেণীর জীবের' সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন ? লেখকের মূল বক্তব্য কি ?

৪. ইংরাজ তথা পৃথিবীর উন্নত জাতি কোন্ কোন্ গুণের দ্বারা অন্যান্য জাতির শীর্ষস্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে ?

৫. 'সে ছিল আমাদের সম্প্রসারণের যুগ, আত্মতৃপ্তির যুগ, পতনের যুগ।' —লেখক একবার বলেছেন 'সম্প্রসারণ' আবার, বলেছেন 'পতন'—কেন ? লেখক এখানে কোন্ যুগের কথা বলেছেন ?

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'যে ভিক্ষুক, যে নিতান্ত দীনহীন, তাহার দানের কোন অর্থ নাই। সে নিজেই কৃপার পাত্র।' কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অংশ এটি ? লেখকের বক্তব্য কি—বুঝিয়ে লেখো।

২. 'এই নির্ভীকতা, গতিশীলতা, ও 'সুদূরের পিয়াস' আছে বলিয়াই ইংরাজ আজ এত উন্নত ; ইহার অভাবে আমরা আজ এত দীন, হীন ও পঙ্গু।' —কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অন্তর্গত এটি ? ইংরাজ ও আমাদের চরিত্রগত পার্থক্যটি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. "'বকাটে' রবার্ট হইল শেষ জীবনে লর্ড ক্লাইভ।"—রবার্ট ক্লাইভ কে ? তিনি কোন্ গুণের জন্য এবং কিভাবে শেষ জীবনে লর্ড ক্লাইভ হয়েছিলেন ?

২. 'তাহাদের দুইটি অপূর্ব গুণ আছে'—কাহাদের ? গুণ দুটি কি কি ?

৩. 'কিন্তু চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ছিল না।'—লেখক 'চিরকাল' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন ? আমাদের অবস্থা কেমন ছিল ?

৪, 'আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমরা বারবার আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি।'—আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা কি ? আমরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বারবার কি-কি ধরনের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করেছি ?

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. অর্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর : ব্রহ্মচর্যসাধন, পর্যবসিত, নির্ভীকতা, গতিশীলতা, জ্ঞানালোক, আন্তর্জাতিক, প্রতিপন্ন, নিকৃষ্ট, আহরণ, গতানুগতিক, গ্রন্থকীট, বিকিরণ, পঙ্গু, উৎসুক, জাগরণ।

২. বিপরীতার্থক শব্দ লেখ : অর্জন, সঞ্চয়, ভিক্ষুক, আহরণ, মর্যাদা, উন্নত, জ্ঞান, নিকৃষ্ট, নির্ভীকতা, গতিশীলতা, প্রবৃত্তি, জিজ্ঞাসা, সম্পদ, সঞ্চয়, উত্থান, সম্প্রসারণ, সুপ্তি, পতন।

৩ বাক্যগঠন কর : বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো, সাত সমুদ্র তের নদী, সুদূরের পিয়াস।

৪. অন্তত তিনটি করে প্রতিশব্দ লেখ : বিশ্ব, ভূধর, তটিনী, তরঙ্গ, সমুদ্র, সম্পদ, জ্ঞান।

৫. সন্ধিবিচ্ছেদ কর : সঞ্চয়, পর্যবসিত, সর্বোচ্চ, জ্ঞানালোক, গতানুগতিক, দুর্দশা, সঙ্কুল, উত্থান, আন্তর্জাতিক।

৬. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর : জগৎ, ব্রহ্মচর্য, মনুষ্যত্ব, পরীক্ষা, সাম্রাজ্য, আকর্ষণ. আহরণ, উৎসুক, কুস্তিগীর, কর্মী, সাহিত্যিক, পালোয়ান, খেলোয়াড়, আন্তর্জাতিক।

৭. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : দীনহীন, ছাত্রজীবন, স্বর্ণপদক, শীর্ষস্থান, চিরাচরিত, জ্ঞানালোক, সুপ্তিভঙ্গ, বিশ্বদরবার, দুর্দশা, ব্যক্তিগত।

৮. শূন্যস্থানে পদ বসাও : এক কথায়, শরীর — ও হৃদয় এই তিন দিক দিয়া জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া — অর্জন করিতে হইবে। 'বকাটে' রবার্ট শেষ জীবনে হইল — ক্লাইভ। — প্রতিযোগিতায় আমরা — — আমাদের যোগ্যতা — করিয়াছি।

৯. বাক্য পরিবর্তন কর : মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইবে। তাহারা সর্বোচ্চ সম্মান ক্লাইভকে কৃতজ্ঞচিত্তে অর্পণ করিল। জ্ঞানালোক বিকিরণ করিয়াছি। আমরা বারবার আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

সাইক্লোন
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক : বঙ্কিম-পরবর্তী এবং রবীন্দ্র-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮)। হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে জন্ম; কৈশোরকাল অতিবাহিত হয় মাতুলালয়ে ভাগলপুরে। সেখানেই এনট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন; কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য আর বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেন নি। কর্মসন্ধানে রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন এবং কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছিল সেখানেই। পরবর্তীকালে দেশে ফিরে এসে হাওড়া জেলার সামতাবেড়ে এবং কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকেন। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক ডি. লিট উপাধি লাভ করেন। জীবনের মাঝামাঝি একসময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে এসে রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েন। যাই হোক, প্রধানত উপন্যাস এবং গল্প রচনার জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' গৌরবে ভূষিত হন এবং একটি স্থায়ী আসন লাভ করেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে কাশীনাথ, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, বামুনের মেয়ে, দেবদাস, পল্লীসমাজ, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের গল্পের সংখ্যা অল্প; কিন্তু তাঁর লেখা 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' শ্রেষ্ঠ বাংলা গল্পের অন্যতম। []

তাঁর লেখা : গভীর জীবনদরদী মরমী লেখক, ব্যথার কাব্যকার শরৎচন্দ্র। বাংলার পল্লীজীবনের নানান সমস্যা সুখদুঃখ ও অভাব-অভিযোগের বর্ণনায় এবং সাধারণ মানুষের বাহির ও ভিতরের জীবনের সত্য আবিষ্কারে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ভ্রষ্ট, স্খলিত, অধঃপতিত, শোষিত মানুষই এঁর রচনার প্রধান লক্ষ্য; উপজীব্য—মানুষের আর্ত ও বিড়ম্বিত জীবন। অত্যন্ত নিরলংকার ভাষায়, সহজ সরল ঘরোয়া: গল্পকথনের ভঙ্গিতে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোয়—সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবনের চিত্র এঁকেছেন। বর্তমান 'সাইক্লোন' রচনাটি তাঁর শ্রীকান্ত (৪ খণ্ডে লিখিত)

উপন্যাসের অন্তর্গত। লেখাটির মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। সরস, কৌতুক-উদ্দীপক ভাষা ও বক্তব্যভঙ্গি এই রচনাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমুদ্র-ঝড়ের একটি অপূর্ব, নিখুঁত, বস্তুগ্রাহ্য রূপও ফুটে উঠেছে এই রচনাটিতে। []

অনেকক্ষণ হইতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে পলাইয়া বেড়াইবার আর জো রহিল না, যেখানে হৌক সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তুলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়া কাপ্তেন দূরবীণ হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এত কষ্টের পরেও আবার সেই গর্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একধারে অনেকগুলা ভেড়া, মুরগী ও হাঁসের খাঁচা উপরি-উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব ক'টিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্র-তরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সেই 'ছাইক্লোন'; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদমাত্র তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নেই,—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে, পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া

আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই, এমন কিছুই জানি না।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতর ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাত শত রাক্ষসীর প্রাণ সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং এই সাত শত রাক্ষসী মৃত্যু যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথাও কি বিপ্লব বাধিয়াছে। তবে রাক্ষসী সাত শত নয়, শত কোটি; উন্মত্ত কোলাহলে এই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়,—ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাহাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা তো ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া শুদ্ধমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল, দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব কত? পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলাম, অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ধাক্কায় বজ্‌বজ্‌ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল, তখন হাতজোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান! এই চোখ দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে! এতদিন ধরিয়া ত সংসারের সর্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ

মাথায় রজত-শুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি ?

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে ; আমি নিজেও ত আরও কতবার এই পথে যাতায়াত করিয়াছি ; কিন্তু এমনটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না। তা ছাড়া চোখে না দেখিলে, জলের ঢেউ যে কোন গতিতেই এত বড় হইয়া উঠিতে পারে, একথা কল্পনার বাপের সাধ্যও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে মনে বলিলাম, হে ঢেউ-সম্রাট্ ! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে, সে ত আমি জানিই ; কিন্তু এখনও ত' তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ-মিনিটকাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি।

একটা জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না ; কারণ তা' হইলে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে, সেই অপরিমেয় শক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্র-জলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে,সেই জ্বালা নানাপ্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীর, কৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব, এই অন্ধকারে হয়ত তেমন করিয়া দেখিতে পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল এবং ভয়ার্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছাইয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

যাহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-

আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ড গোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গিয়াছি; সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে! আশে-পাশে, উপরে-নীচে চারিদিকেই কালো জল! জাহাজসুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ হইবে? কিন্তু মিনিটখানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজসুদ্ধ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিতেছি। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গের আর শেষ হয় না। আমাদের নাগর-দোলা চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পাইলাম কেন কাপ্তেন সাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্তে পুরিয়া চাবি-বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচে হাঁস ও মুরগীগুলা বারকতক ঝট্‌পট্‌ করিয়া এবং ভেড়াগুলা কয়েকবার ম্যা-ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল। আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন আর এক প্রকারের বিপদ জুটিল। শুধু যে জলের ছাট ছুঁচের মত গাঁয়ে বিঁধিতে লাগিল, তাহাই নয়, সমস্ত জামাকাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমন শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে দাঁতে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল, জলে ডোবার হাত হইতে যদি বা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে? এইভাবে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে পরিত্রাণ পাওয়া সত্যিই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম। সুতরাং যেমন করিয়া হোক, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন কোথাও আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাট বল্লমের ফলার মত গায়ে না বেঁধে। একবার ভাবিলাম, ভেড়ার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে কি হয়? কিন্তু তাই বা কতটুকু নিরাপদ? তার মধ্যে যদি সেইরূপ লোনা জলের

স্রোত ঢুকিয়া পড়ে ত নিতান্তই যদি না ম্যা-ম্যা করি, মা মা করিয়াও অন্ততঃ ইহলীলা সমাপ্ত করিতে হইবে।

শুধু এক উপায় আছে। জাহাজের পার্শ্বপরিবর্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায় ; অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয়ত বাঁচিতেও বা পারি। যে কথা, সেই কাজ। কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদি-বা সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ। লোহার কবাট হাজার ঠেলা-ঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং আবার সেই পথ তেমনি অতিক্রম করিয়া ফার্ষ্ট ক্লাসের দোরগোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম। এবার ভাগ্য-দেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরালা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ্ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটার মধ্যে ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোরবেলা পর্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

অনুশীলনী

বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়,—ঝড়।'—লেখক কোন্ ঝড়ের কথা বলেছেন ? সেই ঝড়ের আবির্ভাব, ক্রিয়া এবং তিরোভাবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২. 'এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজত-শুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!'—কোন্ প্রসঙ্গে লেখক এই উক্তি করেছেন ? এই 'বিরাটকায় মহাতরঙ্গের' বর্ণনা দাও। উহা 'বড় বিস্ময়' বলে লেখকের মনে হয়েছে কেন ?

৩. 'যাঁহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন।''—কার শুভাগমনের কথা বলা হয়েছে ? তার শুভাগমনের জন্য 'এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজনে'র বর্ণনা দাও। শুভাগমনের পর কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ?

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদমাত্র তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।'—কোন্ লেখকের কোন রচনার অন্তর্গত? লেখকের বক্তব্য কি, বুঝিয়ে লেখ। 'গোষ্পদ' শব্দটির অর্থ কি?

২. 'তবে রাক্ষসী সাত শত নয়, সাত কোটি; উন্মত্ত কোলাহলে এইদিকে ছুটিয়া আসিতেছে।'—কোন্ রচনার অন্তর্গত? লেখক কে? লেখক 'রাক্ষসী' বলেছেন কাকে? সাত শত নয়, সাত কোটি—বলবার অর্থ কি? 'উন্মত্ত কোলাহল' বলতেই বা লেখক কি বুঝিয়েছেন?

৩. 'এই চোখ দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে!'—কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অন্তর্গত? লেখক কার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলছেন? এরূপ প্রশস্তি করবার কারণ কি?

৪. 'হে ঢেউসম্রাট! তোমার সংঘর্ষে……যেন দেখিয়া লইতে পারি।'—কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অন্তর্গত? লেখক 'ঢেউ-সম্রাট' বলিয়া কাকে সম্ভাষণ করেছেন? অংশটির অর্থ সহজভাবে বুঝিয়ে লিখ।

৪. 'কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার……আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।'—কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অংশ? 'বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন? লেখক কেন, কিভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন?

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই।'—নিরাপদ' জায়গাটির পরিচয় দাও। জায়গাটি কি শেষ পর্যন্ত সত্যই নিরাপদ ছিল?

২. 'এও যেন তেমনি কোথাও কি বিপ্লব বাধিয়াছে।'—'এও' বলতে লেখক কার কথা বলেছেন? তিনি কার সঙ্গে এর তুলনা দিয়েছেন? 'বিপ্লব' বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন?

৩. 'জাহাজযদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'—'পাতালের রাজবাড়ীতে' 'নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়ার অর্থ কি? লেখক কোন্ সময়কার কথা বলেছেন? তখন কি এমন কৌতুক করবার অবকাশ ছিল?

৪. 'যদি না ম্যা-ম্যা করি, মা মা করিয়াও অন্ততঃ ইহলীলা সমাপ্ত

করিতে হইবে।'—'ম্যা-ম্যা' করার কথা আসছে কেন? 'মা মা' করে ইহলীলা সমাপ্ত করবার ব্যাপারটি কি?

৫. 'শুধু এক উপায় আছে।'—কি উপায়? তাতে লেখকের কতখানি সুরাহা হয়েছিল?

● **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. বাক্যে প্রয়োগ কর: গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, অচিন্তনীয়, হৃদয়ঙ্গম বিকট, বজ্‌বজ্‌ করিয়া, বিরাটকায়, মহাতরঙ্গ, রজত-শুভ্র কিরীট, থরথর করিয়া কাঁপা, ওলট-পালট, ভবলীলা, ছুঁচের মত গায়ে বেঁধা, ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপা, মিয়াদ, ইহলীলা।

২ পদ পরিবর্তন কর: সন্ধ্যা, আশ্রয়, আকাশ, বিকট, পৃথিবী, দুর্জয়, সামর্থ্য, নিঃসন্দেহ, অস্পষ্ট, দৃষ্টি, সার্থক, অচিন্তনীয়, বিস্ময়, বিলম্ব, অভিভূত, উদ্‌ঘাটিত, উন্মত্ত, সমাপ্তি, প্রচণ্ড, শীত, পরিত্রাণ, দ্বিধা।

৩. সন্ধিবিচ্ছেদ কর: অন্বেষণ, গোষ্পদ, ক্রমাগত, যাতায়াত, সংঘর্ষ, ততোধিক, ভয়ার্ত, পর্যন্ত।

৪. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: স্বস্থান, অস্থিমজ্জা, জনশূন্য, মন্ত্রবল, রাজপুত্র, অনুক্ষণ, ক্রমাগত, বিরাটকায়, মহাতরঙ্গ, রজত-শুভ্র, আলোকমালা, ভয়ার্ত, শুভাগমন, চাবি-বন্ধ, নিঃসংশয়, পার্শ্বপরিবর্তন, ফার্ষ্টক্লাস, লেশমাত্র।

৫. বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: নিরাপদ, হাল্কা, সার্থক, বিলম্ব, বিস্তৃতি, সাঙ্গ, বিপদ, প্রচণ্ড, অবতরণ, নিরালা, রাগ।

৬. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর: **বৃষ্টি** পড়িতেছিল। **মন্ত্রবলে** যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। উন্মত্ত **কোলাহলে** এই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। সেই **মহাতরঙ্গ** আসিয়া পড়িলেন। এক প্রকারের **বিপদ** জুটিল।

৭. চলিত ভাষায় পরিবর্তন কর: এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল।

৮. শূন্যস্থান পূরণ কর: মাস্তলের পাশ দিয়া — মারিয়া দেখিলাম। হঠাৎ বুকের — কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাহাদের আসাই — ভাল ছিল। জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ধাক্কায় — করিয়া — উপরের দিক ঠেলিয়া উঠিতেছে। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া — বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর — করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

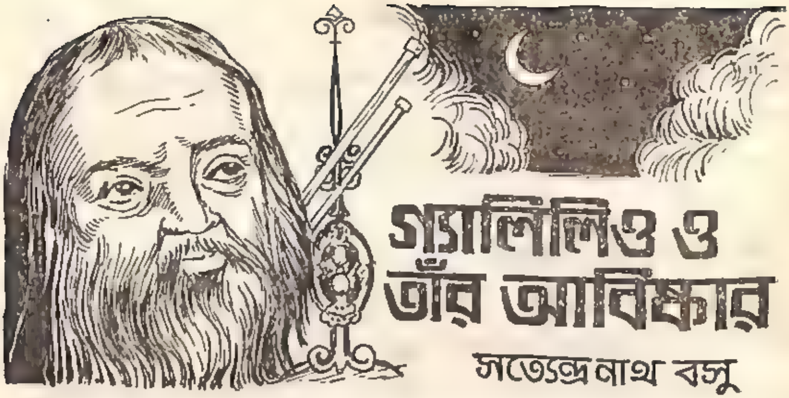

গ্যালিলিও ও তাঁর আবিষ্কার

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

লেখক ঃ শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪—১৯৭৪)। জন্মস্থান ঃ ২৪ পরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়া-সংলগ্ন একটি অখ্যাত পল্লীগ্রাম। কৃতী ছাত্র। এনট্রান্স ও এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম এবং গণিতে অনার্সসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যাপনাকালে কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন, পরমাণু-বিজ্ঞান গবেষণায় এক নতুন দিগন্ত আবিষ্কৃত হয়। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকে তাঁর নাম। পরে ইউরোপ গমন করেন এবং মাদাম কুরি ও আইনস্টাইনের সঙ্গে গবেষণা করেন। এরপর খয়রা অধ্যাপকরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে নিযুক্ত থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথের মন ছিল বিশ্বমুখী। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত প্রভৃতিতে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তার ও বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারে তিনি আজীবন প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। নির্ভীক দেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা ও মানবিকতাবাদী সত্যেন্দ্রনাথ চিরনমস্য বাঙালি। []

তাঁর লেখা ঃ বাংলা ভাষায় শিক্ষাপ্রসার ও বিজ্ঞানচর্চার বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর অবদান অপরিসীম। কর্মজীবনে নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। সংকলিত রচনাটি তাঁর লেখা 'বিজ্ঞানের সঙ্কট' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। 'আধুনিক বিজ্ঞানের জনক' গ্যালিলিওর চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রবন্ধটি লিখিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সাদামাটা ঝকঝকে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রাচীন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও-র জীবনকথা ও আবিষ্কার কাহিনী চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনাভঙ্গির দিক থেকে একমাত্র উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের সঙ্গেই তুলনীয়। []

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৫৬৪ সালে গ্যালিলিও পিসাতে জন্মেছিলেন। তাঁর পরিবারের নাম ছিল গ্যালিলাই। পিতা পুরাণ-সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন, সংগীত ও গণিতে তাঁর দখল ছিল।

প্রথমে তেরো বৎসরের ছেলে গ্যালিলিও দুই বৎসর ধরে সাহিত্য, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। ১৫৮১ সালে সতের বৎসরে ঢুকলেন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়তে। তখন অ্যারিস্টটলীয় যুগ। সেই গ্রীক দার্শনিকের কথা সকলেই মাথা পেতে নেয় নির্বিচারে। গ্যালিলিওর ঝোঁক কিন্তু অল্প বয়স থেকেই হাতে-কলমে করে দেখতে। যুক্তিতর্কের প্রতি প্রবণতা তাঁর সারা জীবনে লক্ষ্য করবার জিনিস। এই স্বভাবই শেষজীবনে তাঁর অশেষ দুঃখের কারণ হল।

পরিবারের এক বন্ধু ছিলেন গণিতশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। একদিন কোন কাজে গ্যালিলিও এসেছেন তাঁর বাড়িতে। তাসকানীর শাসকের পুত্র তখন সেই পণ্ডিতের কাছে পড়ছে। গ্যালিলিও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সেই গণিতের ব্যাখ্যা। গণিতের অধ্যয়ন বাসনাই প্রবল হয়ে উঠল। গ্যালিলিওর ডাক্তারী পড়া হল না। নানা কারণে গৃহস্থালী উঠে এল ফ্লোরেন্সে। এখানে সেই সভা-পণ্ডিতের কাছে পড়তে শুরু করলেন গণিত ও পদার্থবিদ্যা। এই বিদ্যায় ও অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা এল, নানা দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। চব্বিশ বৎসর বয়সে এই নিয়ে তিনি মেতে আছেন, উদ্ভাবন করছেন নানা-রকমের যন্ত্র। নবীন বিজ্ঞানীকে প্রথমে ভুগতে হয়েছিল অর্থকষ্টের জন্যে। তবে ১৫৮৮ সালে দেখি, পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষকতা করছেন। আয় মাত্র ষাট scudi (স্কুডি)। বর্তমান হিসাবে এটা ৯০০/১০০০ টাকা বাৎসরিক আয়ের সামিল হবে। এতে পরিবারের সব খরচ চালানো দুষ্কর। তখন ইটালীতে একান্নবর্তী পরিবারের যুগ। বাপ মারা গেলেন ১৫৯১ সালে। গ্যালিলিও হলেন কর্তা।

সংসারে অনটন বাড়ল। ১৫৯২ সালে এলেন পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপনা ত আছেই, তা ছাড়া দেশরক্ষার নানা ব্যাপারে পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন। নিজে কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসে গভীর বিশ্বাসী। অবশ্য তখনও সর্বত্র টলেমীর যুগ চলেছে। রাশিচক্র ও গ্রহ-নক্ষত্র সবই

অচল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে—এই পরিবেশে গ্রহদের অবস্থান নিয়েই জ্যোতিষের বিচার ও গণনা টলেমীয় পন্থায় করতে হয়। এদিকে গ্যালিলিও নতুন মতবাদ নিয়ে মেতে আছেন। পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন কোপারনিকাসের মতবাদের পক্ষে। এই সময়ে তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদের বিপক্ষে কেউ আপত্তি জানাল না।

১৬০৯ সালে হল্যাণ্ডে একজন কাচের লেন্‌স নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি নলের দু-পাশে রেখে দেখলেন, দূরের জিনিস এ-ভাবে বড় দেখায়। গ্যালিলিওর কাছে এই খবর পৌঁছল। তিনিও দূরবীন তৈরি করতে পারলেন। এটি আরো ভাল ও শক্তিশালী হল। ভেনিস-এর কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর এতে কদর বেড়ে গেল। সমুদ্রপথে ভেনিসের নৌবাহিনী তখন ঘুরে বেড়ায়। কর্তৃপক্ষ ভাবলেন, এই দূরবীন সব জাহাজেই বসাতে হবে। গ্যালিলিওর উপর ভার পড়ল দূরবীন যোগান দেবার। গ্যালিলিও রাজী হলেন। বাড়ি হয়ে উঠল ফ্যাক্‌টরি-কারু-শালা। সেখান থেকে প্রচুর দূরবীন বিক্রি হতে লাগল।

এবার গ্যালিলিও পেলেন হাতের কাছে বিশ্ব-সমীক্ষার এক প্রধান যন্ত্র। আকাশের দিকে ফিরিয়ে গ্যালিলিও অনেক নতুন দৃশ্য দেখলেন। তাঁর আগে এ-সব মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। চাঁদের পাহাড়, ছায়াপথের মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারার সমাবেশ চোখে ধরা পড়ল, আবার এল নতুন নতুন উপগ্রহের খবর। আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে একটি মাত্র চন্দ্রমা। গ্যালিলিও দেখলেন বৃহস্পতি গ্রহের চারটি উপগ্রহ ঘুরছে। তখনকার দিনের ধার্মিক পণ্ডিতেরা এ-সব বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তাঁরা ভাবলেন, এইভাবে কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসের সপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করে গ্যালিলিও অন্যায় করছেন। যা চোখে দেখা যায় না, তা যন্ত্রে প্রতিপন্ন হলে সেটা যন্ত্রেরই কারসাজি। গ্যালিলিওর নাম তখন দেশে দেশে অভিনন্দিত হচ্ছে। ভেনিসের রাজ-সরকারের কাছ থেকে অর্থও পাচ্ছেন প্রচুর। তবে এত কাজের মধ্যে বিজ্ঞানীর অবসর মেলে না। ১৬০৯ সালে তাসকানীর বৃদ্ধ ডিউক মারা গেলেন

ও গালিলিওর ছাত্র কসমো সেই গদিতে বসলেন। শেষে ১৬১০ সালের শরৎকালে তাসকানীর নতুন গ্র্যাণ্ড ডিউক নিজের পুরনো গুরুকে আশ্রয় দিলেন। হাজার scudi (স্কুডি) মাইনে প্রতি বৎসর। পাডুয়া ছেড়ে ফ্লোরেন্সে গেলেন গ্যালিলিও। এবার বিজ্ঞান-সেবার প্রচুর অবসর মিলল। তবে যে-সব নতুন কথা বললেন, বিশেষ করে জ্যোতিষের বিষয়ে, তাতে ইউরোপের পণ্ডিত-মহলে হই-চই বেধে গেল। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। তা-ছাড়া আর এক কারণে তাঁর সব আবিষ্কার ও মতামত শুধু পণ্ডিত-মহলে আবদ্ধ রইল না। পণ্ডিতী-মহলে চালু ল্যাটিন ছেড়ে লিখতে আরম্ভ করলেন নিজের আবিষ্কার ও মতবাদ ইটালীয়ান ভাষায়।

কোপারনিকাসের মতবাদ তাঁর কাছে অভ্রান্ত মনে হল। সনাতনীরা কিন্তু তাঁর বিরোধিতা করতে লাগলেন। ধর্মযাজকেরা প্রচার করতে লাগলেন যে গ্যালিলিওর অধ্যাপনা ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী, বাইবেলের অনেক কথার সরাসরি বিরুদ্ধে। তাঁরা গোপনে অভিযোগ করলেন, গ্যালিলিও ধর্ম-বিদ্বেষ প্রচার করছেন, বাইবেলের উপর মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করতে চাইছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গোপনে কাজ আরম্ভ করল। প্রথমে Inquisition (ইন্‌কুইজিশন) রায় দিলেন যে, সূর্য যে জগতের কেন্দ্র-স্বরূপ—এটি অযৌক্তিক এবং যথার্থ ধর্মমতের পরিপন্থী। সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও প্রকাশ করলেন যে পৃথিবীর আহ্নিক বা বার্ষিক গতির ধারণা প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী। ১৬১৬ সালের মার্চ মাসে কোপারনিকাসের বই ও তৎসংক্রান্ত আরও দুইটি বইয়ের প্রচার তাঁরা নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং পুণ্যাত্মা পোপের কাছে এই খবর পৌঁছে দিলেন।

পোপ আদেশ দিলেন কার্ডিনাল বেলারমিন যেন গ্যালিলিওকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করতে। কার্ডিনাল বেলারমিন গ্যালিলিওকে বললেন, কোপারনিকাসের তত্ত্ব নিয়ে তিনি যেন ধর্ম-

যাজকদের সঙ্গে তর্ক না করেন বা বাইবেল থেকে লাইন উদ্ধৃত করে নিজের ইচ্ছামত তার ব্যাখ্যা করতে না চেষ্টা করেন। গ্যালিলিও রাজী হলেন। তারপরেও তিনি যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানের বই লিখলেন, গতির কথা বা ভাসমান বস্তুর স্থিতি-রহস্য—সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনের আকারে দুই মতবাদের আলোচনা করে বই লিখে ছাপাবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। পোপ ও বেলারমিন মারা যাবার পর নতুন আর একজন পোপের পদে অধিষ্ঠিত। তাঁর বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। শেষে গ্যালিলিওর ডাক পড়ল। বারোই এপ্রিল তিনি কারারুদ্ধ হলেন। ৩০শে এপ্রিল গ্যালিলিওকে স্বীকার করানো হল যে, যা-কিছু তিনি এই বিষয়ে কথোপকথনের ছলে লিখেছেন, সে-সবই তাঁর বৃথা গর্বের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার নিদর্শন।

তাঁর নির্যাতনের এখানেই শেষ হল না। তাঁর মুখ দিয়ে বলানো হল, তিনি কোপারনিকাসের মতে বিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিচারকদের সামনে অনুতাপ-ব্যঞ্জক সাদা পোশাক পরে তিনি হাঁটু গেড়ে রইলেন। বিচারকেরা বললেন, 'তোমার ভুল দেশের ভয়ানক অমঙ্গল করেছে। তার শাস্তি তোমায় পেতে হবে, তোমার বই নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হবে। আমাদের আদেশে তোমাকে কারারুদ্ধ থাকতে হবে যতদিন আমরা তোমাকে রাখতে চাই। তা-ছাড়া তিন বৎসর ধরে প্রতি সপ্তাহে তোমাকে অনুতাপ-সূচক প্রার্থনা করতে হবে।' এর দুই দিন বাদে Inquisition (ইন্‌কুইজিশন) তাঁকে ফ্লোরেন্সের দূতাবাসে প্রেরণ করলেন। প্রথমে তাঁকে সিয়েনাতে আর্চবিশপের নজরবন্দী করে রাখা হল। তারপর ফ্লোরেন্সের শহরতলীতে নিজের গৃহে অন্তরীণ রইলেন।

দুঃখ-কষ্টে গ্যালিলিওর জীবনের শেষ নয় বৎসর কাটল। যে-মেয়ে তাঁর পরিচর্যা করত, সেও মারা গেল। অন্ধ হয়ে যেতে বসলেন। শেষের পাঁচ বৎসর কিছুটা অব্যাহতি পেলেন পোপের করুণায়। নানা দেশ থেকে অনেকে তখন তাঁকে দেখতে আসত, তাঁর বই ও লেখা অবৈধভাবে অন্য

দেশে চালান ও ছাপা হয়েছে। ৮ই জানুয়ারি ১৬৪২ সালে সাতাত্তর বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

গ্যালিলিও প্রথমে সনাতনী ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে তিনি কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার যাঁতায় গুঁড়ো হয়ে গেলেন। তবে মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ রইল না।

চারশত বৎসর বাদে নানা লোকের তাঁর প্রতি ভক্তির অর্ঘ্য সেই সত্যের জয় ঘোষণা করছে ঃ 'সত্যমেব জয়তে।'

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. গ্যালিলিও কে? তাঁর প্রথম জীবন থেকে পিসায় গণিতের শিক্ষক হওয়া অবধি তাঁর জীবনকথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২. গ্যালিলিও কিভাবে দূরবীন নির্মাণ করেন? তাঁর বিশ্ব-সমীক্ষা এবং মহাকাশে নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩ গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয় কেন? তার ফলে গ্যালিলিওর জীবনে কি পরিণাম ঘটে?

৪. সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও: অ্যারিস্টটল, টলেমি, কোপারনিকাস, ইনকুইজিশন।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'যুক্তিতর্কের প্রতি প্রবণতা তাঁর সারাজীবনে লক্ষ করবার জিনিস। এই স্বভাবই শেষ জীবনে তাঁর অশেষ দুঃখের কারণ হল।'—কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে অংশটি নেওয়া হয়েছে? কার সম্পর্কে বলা হয়েছে? তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? তার পরিণতি তাঁর শেষ জীবনে কিরকম হয়েছিল?

২. 'এই সময়ে তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদের বিপক্ষে কেউ আপত্তি জানায় নি।' —কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অন্তর্গত এটি? তাঁর 'বৈপ্লবিক মতবাদ' কি ছিল? তাতে কেউ তখন আপত্তি জানায় নি কেন?

৩. 'তাঁরা ভাবলেন, এইভাবে কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসের সপক্ষে

মাসের খররৌদ্রে বালি গরম, বাতাস একেবারে আগুন। মাঠের চারিধারে কোনদিকে সবুজ গাছপালার কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না। এক আধটা বাবলা গাছ যা আছে তাও পত্রহীন, মাঠের ঘাস রোদেপোড়া—কটা। ব্রাহ্মণের কাপড়-চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হয়ে উঠলো, আর গায়ে রাখা যায় না। এক একটা আগুনের ঝলকের মতো দমকা হাওয়ায় গরম বালি উড়ে এসে তাঁর চোখে-মুখে তীব্র হয়ে বিঁধছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুর বেলা এ মাঠ পার হতে যাওয়া যে ইচ্ছে করে প্রাণ দিতে যাওয়ার সামিল, এ কথা নবাবগঞ্জের বাজারে তাঁকে অনেকে বলেছিল, তবুও যে তিনি কারুর কথা না শুনে জোর করেই বেরুলেন, সে কেবল বোধ হয় কপালে দুঃখ ছিল বলেই।

পশ্চিমদিকে অনেক দুরে একটা উলুখড়ের খেত গরম বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই কেবল চক্‌চকে খরাবালির সমুদ্র। ব্রাহ্মণের ভয়ানক তৃষ্ণা পেল, গরম বাতাসে শরীরের সব জল যেন শুকিয়ে গেল, জিভ জড়িয়ে আসতে লাগলো। তৃষ্ণা এত বেশী হল যে, সামনে ডোবার পাতাপচা কালো জল পেলেও তা তিনি আগ্রহের সঙ্গে পান করেন। কিন্তু নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত সাড়ে চার ক্রোশ বিস্তৃত এই প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে যে কোথাও জল পাওয়া যায় না, তা তো তাঁকে কেউ কেউ বাজারে বলেছিল। এ কষ্ট তাঁকে ভোগ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমেই ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর কান দিয়ে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাসে যেন আগুনের ঝলক বেরুতে লাগলো। জিভ জোর করে চুষলেও তা থেকে আর রস পাওয়া যায় না, ধুলোর মত শুকনো। চারিদিকে ধূ-ধূ মাঠে, খররৌদ্রে যেন নাচছে···চক্‌চকে বালিরাশি রৌদ্রে ফিরিয়ে দিচ্ছে—মাঝে মাঝে ছোট ঘূর্ণী হাওয়া গরম বালি ধুলো কুটো উড়িয়ে নাকে মুখে নিয়ে এসে ফেলছে। অসহ্য পিপাসায় তিনি চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখতে লাগলেন। মনে হতে লাগলো—একটু ঘন সবুজ মত যদি কোন পাতাও পাই তা হলে চুষি। জীবনে তিনি যত ঠাণ্ডা

জল খেয়েছিলেন, তা এইবার তাঁর একে একে মনে আসতে লাগলো। তাঁর বাড়ীর পুকুরের জল কত ঠাণ্ডা—পাহাড়পুরের কাছারীর ইঁদারার জল সে তো একেবারে বরফ···কবে তিনি শিষ্যবাড়ী গিয়েছিলেন, বৈশাখ মাসের দিনে তারা তাঁকে বড় বড় সাদা কাঁসার ঘটি করে নতুন কলসীর জল খেতে দিয়েছিলেন, সে জল একেবারে হিম, খাবার সময় দাঁত কন্‌কন্‌ করে। আচ্ছা, এখন যদি সেই রকম এক ঘটি জল কেউ তাঁকে দেয়। তাঁর তৃষ্ণাটা হঠাৎ বেড়ে বুকের কলিজা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠলো। এ মাঠটাকে এ অঞ্চলে বলে কচুচুষির মাঠ। তাঁর মনে পড়লো, তিনি শুনেছিলেন, এ জেলার মধ্যে এত বড় মাঠ আর নেই, আগে আগে অনেকে নাকি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে এ মাঠ পার হ'তে গিয়ে সত্যি সত্যি প্রাণ হারিয়েছে, গরম বালির ওপর তাদের নির্জীব দেহ লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। অসহ্য জলতৃষ্ণায় তারা আর চলতে অক্ষম হয়ে গরম বালির উপর ছটপট করে প্রাণ হারিয়েছে। সত্যিই তো। এখনও তো দু'ক্রোশ দূরে গ্রাম—যদি তিনিও ?

শুধু মনের জোরে তিনি পথ চলতে লাগলেন। এই পথ হাঁটার শেষে কোথায় যেন এক ঘটি ঠাণ্ডা কন্‌কনে-হিমজল তাঁর জন্য কে রেখে দিয়েছে, পথ হাঁটার বাজী জিতলে সেই জলের ঘটিটাই যেন তাঁর পুরস্কার, এই ভেবেই তিনি কলের পুতুলের মত চলছিলেন। আধক্রোশটাক পথ চলে উলুখড়ের বনটা ডাইনে ফেলেই দেখলেন, বোধ হয় আট ক্রোশ পথ দূরে একটা বড় বটগাছ। গাছটার তলায় কোনো পুকুর হয়তো থাকতে পারে, না থাকে ছায়াও তো আছে।

বটতলায় পেঁ ৗছে দেখলেন একটা জলসত্র। চার-পাঁচটা নতুন জালায় জল, পাশে একরাশি কচি ডাব। এক ধামা ভিজে ছোলা, একটা বড় জায়গায় অনেকটা নতুন আখের গুড়, একটা ছোট ধামায় আধ ধামা বাতাসা। বাঁশের চেরা একটা খোল লতার দড়ি দিয়ে আর একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে বাঁধা। একজন জালা থেকে জল উঠিয়ে

চেরা বাঁশের খোলে ঢেলে দিচ্ছে। আর লোকেরা বাঁশের খোলের এ-মুখে অঞ্জলি পেতে জল পান করছে।

গাছতলায় যারা বসেছিল, ব্রাহ্মণ দেখে শিরোমণি-মশাইকে তারা খুব খাতির করলে। একজন জিজ্ঞেস করলে—ঠাকুরমশায়ের আগমন হচ্ছে কোথা থেকে?

একজন বললে—আহা, সে কথা রাখ, বাবাঠাকুর আগে ঠাণ্ডা হোন।

শিরোমণি-মশায় যেখানে বসলেন সেখানে প্রকাণ্ড বটগাছ প্রায় দু'তিন বিঘা জমি জুড়ে আছে। হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা লম্বা ঝুরি চারিদিকে নেমেছে।…একজন তাঁকে তামাক সেজে দিয়ে একটা বটপাতা ভেঙে নিয়ে এল নল করবার জন্যে। আঃ কি ঝিরঝিরে হাওয়া। এই অসহ্য পিপাসা ও গরমের পর এমন ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস ও তৈরী তামাকে তাঁর তৃষ্ণাও যেন অনেকটা কমে গেল।

তামাক খাওয়া শেষ হলো। একজন বললেন—ঠাকুরমশায়, হাত পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন। ভাল সন্দেশ আছে ব্রাহ্মণদের জন্য আনা, সেবা করে একটু জল খান, এই রোদে আর এখন যাবেন না—বেলা পড়ুক।

তারপর শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞেস করলেন—এ জলসত্র কাদের?

—আজ্ঞে, ঐ আমডোবের বিশ্বেসদের। শ্রীমন্ত বিশ্বেস আর নিতাই বিশ্বেস—নাম শুনেছেন?

শিরোমণি-মশায় বললেন—বিশ্বেস সদ্গোপ?

—আজ্ঞে না, কলু।

সর্বনাশ! নতুন মাটির জালাভর্তি জল ও কচি ডাবের রাশি দেখে পিপাসার্ত শিরোমণি-মশায় যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা এক মুহূর্তে কর্পূরের মত উড়ে গেল। কলুর দেওয়া জলসত্রে তিনি কি করে জল খাবেন? তিনি নিজে এবং তাঁর বংশ চিরদিন অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী; আজ কি তিনি—ওঃ, ভাগ্যি কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—নইলে, এখনি তো…

শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞেস করলেন—এ জলসত্র কতদিনের দেওয়া ?

—তা আজ প্রায় পনের ষোল বছর হবে ; শ্রীমন্ত বিশ্বেসের বাপ তারাচাঁদ বিশ্বেস এই জলসত্র বসিয়ে যায়। সে হয়েছিল কি, বলি শুনুন। বলে, লোকটা সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করল।

আমডোবের তারাচাঁদ বিশ্বেস যখন ছোট—চোদ্দ-পনের বছর বয়েস তখন তার বাপ মারা যায়। সংসারে কেবল ন'দশ বছরের একটি বোন ছাড়া তারাচাঁদের আর কেউ ছিল না। ভাই-বোনে মাথায় করে কলা, বেগুন, কুমড়ো এইসব হাটে বিক্রি করতো, এতেই সংসার চলতো। সেবার বোশেখ মাসের মাঝামাঝি তারাচাঁদ ছোট বোনটিকে নিয়ে নবাবগঞ্জের হাটে তালশাঁস বিক্রি করতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় তারাচাঁদ মাঠের আর কিছু ঠিক পায় না—নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত এই মাঠটা সাড়ে চার ক্রোশের বেশী তো কম নয়। কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই। বোশেখ মাসের দুপুর রোদে মাঠ বয়ে আসতে তারাচাঁদের ছোট বোনটা অবসন্ন হয়ে পড়লো। তারাচাঁদের নিজের মুখে শুনেছি, ছোট বোনটি মাঠের মাঝামাঝি এসে বল্‌লে—দাদা, আমায় বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল খাবো।

তারাচাঁদ তাকে বোঝালে, বললে—এগিয়ে চল্‌, রতনপুরের কৈবর্ত-পাড়ায় জল খাওয়াবো।

সেই একটু এগিয়ে মানে দু'ক্রোশের কম নয়। আর খানিকটা এসে মেয়েটা তেষ্টায় রোদে অবসন্ন হয়ে পড়লো ; বার বার বলতে লাগলো—ও দাদা তোর পায়ে পড়ি। দে আমায়, আমায় একটু জল—

তারাচাঁদ তাকে কোলে তুলে নিয়ে এই বটগাছটার ছায়ায় নিয়ে এসে ফেলল। ছোট মেয়েটা তখন আর কথা বলতে পারছে না। তারাচাঁদ তার অবস্থা দেখে তাকে নামিয়ে রেখে ছুটে জলের সন্ধানে গেল। এখান থেকে আধক্রোশ তফাত রতনপুরের কৈবর্তপাড়া থেকে এক ঘটি জল চেয়ে এনে দেখে তার ছোট বোনটা গাছতলায় মরে পড়ে

আছে, তার মুখে একটা কচুর ডগা। এই বটগাছটা তখন ছোট ছিল, ওরই তলায় অনেক কচু বন ছিল। তেষ্টার যন্ত্রণায় মেয়েটা সেই বুনো কচুর ডগা মুখে করে তার রস চুষেছিল—সেই থেকে এই মাঠটার নাম হল—কচুচুষির মাঠ।

তারাচাঁদ বিশ্বেস ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছিল। শুনেছি নাকি তার সে বোন স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে বলতো—দাদা, ঐ মাঠের মধ্যে সকলের জলখাবার জন্যে তুই একটা জলসত্র করে দে। তাই তারাচাঁদ বিশ্বেস এখানে এই বটগাছ পিতিষ্ঠে করে জলসত্র বসিয়ে গেছে—সে আজ পনের ষোল কি বিশ বছরের কথা হবে। ঠাকুরমশায়, কচুচুষির মাঠের জলসত্র এদিকের সকলেই জানে। বলবো কি বাবাঠাকুর, এমনও শুনেছি যে, ম্যাঠের মধ্যে জল তেষ্টায় বেঘোরে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন লোক নাকি কেউ কেউ দেখেছে, একটা ছোট মেয়ে মাঠের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে বলচে—ওগো, আমি জল দেবো, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

লোকটা তার কাহিনী শেষ করলে; তারপর বললে—সত্যি মিথ্যে জানিনে, ঠাকুরমশাই, লোকে বলে তাই শুনি, বোশেখ মাসের দিন ব্রাহ্মণের কাছে মিথ্যা বলে কি শেষকালে—

লোকটা দুই হাতে নিজের কান মলে, কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে একটা প্রণাম করলে।

বেলা পড়ে এল। কত লোক জলসত্রে আসতে লাগলো। একজন চাষা পাশের মাঠ থেকে লাঙ্গল ছেড়ে বটতলায় উঠলো। ঘেমে সে নেয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম করে সে তৃপ্তির সঙ্গে ছোলা গুড় আর জল খেয়ে বসে গল্প করতে লাগলো।

এক বুড়ি অন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে ফিরছিল। গাছতলায় এসে সে ঝুলি নামিয়ে একটু জল চেয়ে নিয়ে হাত-পা ধুলে। একজন বললে—আবদুলের মা, একটা ডাব খাবা?

আবদুলের মা একগাল হেসে বললে—তা দাও দিকি মোরে, আজ অ্যাকটা খাই। মরবো তো খেয়েই মরি।

একজন লোক পরনে টাটকা কোরা কাপড়ের ওপর পাটভাঙা ধপধপে সাদা টুইলের সার্ট হাঁটু পর্যন্ত কাপড় ঝোলা, পায়ে এক পা ধুলো, বটতলায় এসে হতাশভাবে ধপ্ করে বসে পড়লো। কেউ জিজ্ঞেস করলে— জমিরদ্দি মিঞা যে? আজ ছানির দিন ছিল না?

জমিরদ্দি সম্পূর্ণ ভদ্রতাসঙ্গত নয়, এরূপ একটি বাক্য উচ্চারণ করে ভূমিকা ফেঁদে তার মোকদ্দমার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে গেল এবং যে উকিলের হাতে তার কেস্ ছিল তাঁর সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করল যে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে জমিরদ্দির বিরুদ্ধে আর একটা কেস্ পেতেন। তারপর সে পোয়াটাক আখের গুড়ের সাহায্যে আধসের আন্দাজ ভিজে ছোলা উদরসাৎ করে এক ছিলিম তামাক খেয়ে বিদায় নিলে।

ক্রমে রোদ পড়ে এল। বৈকালের বাতাসে কাছেরই একটা ঝোপবন থেকে ডাঁশা খেজুরের গন্ধ ভেসে আসছিল। হল্দে রঙের সোঁদালী ফুলের ঝাড় মাঠের পেছনটা আলো করে ছিল। একটা পাখী আকাশ বেয়ে ডানা মেলে চলেছিল—বৌ কথা—ক', বৌ কথা—ক'।

শিরোমণি-মশায়ের বসে বসে মনে হ'ল, বিশ বছর আগে তাঁর আট বছরের পাগলী মেয়ে উমার মতই ছোট একটি মেয়ে এই বটতলায় অসহ্য পিপাসায় জল অভাবে বুনো কচুর ডাঁটার কটু রস চুষেছিল, আজ তারই স্নেহ-করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায় বেড়ে উঠে জলকষ্টপীড়িত পল্লীপ্রান্তরের এক ধারে পিপাসার্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরী করেছে। এরই তলায় আজ বিশ বছর ধরে সে মঙ্গলরূপিণী জগদ্ধাত্রীর মত দশ হাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘ-মধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লী-পথিকদের জল যোগাচ্ছে। চারিধারে যখন সন্ধ্যা নামে, তপ্ত মাঠ পথ যখন ছায়া-শীতল হ'য়ে আসে তখনই কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সে মেয়েটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় শুভ্র আঁচল উড়িয়ে কোন অজ্ঞাত ঊর্ধ্ব-লোকে তার নিজের স্থানটিতে ফিরে চলে যায়—তার পৃথিবীর বালিকা-জীবনের ইতিহাস সে ভোলে নি।

যে লোকটা জল দিচ্ছিল তার নাম চিনিবাস, জাতে সদ্‌গোপ। শিরোমণি-মশায় তাকে বললেন, ওহে বাপু, তোমাদের ঐ বড় ঘটিটা বেশ করে মেজে, এক ঘটি জল আমায় দাও, আর ইয়ে—ব্রাহ্মণের জন্য আনা সন্দেশ আছে বললে না ?

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. কচুচুষির মাঠ নামটির পেছনে যে করুণ কাহিনী আছে তা নিজের ভাষায় লেখ। গল্পটি পাঠককে এত আকর্ষণ করে কেন ?

২. কচুচুষির মাঠে বৃদ্ধ মাধব শিরোমণির পিপাসায় যে কষ্ট হয়েছিল তা বর্ণনা কর ; প্রথমে তিনি জলপানে অনিচ্ছুক হয়েছিলেন কেন ?

৩ "ওহে বাপু তোমাদের ঐ বড় ঘটিটা বেশ করে মেজে, এক ঘটি জল আমায় দাও।"—এই উক্তিটি কার ? কিভাবে তাঁর পূর্বেকার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল এবং কেন-ই বা ঘটল তা বিবৃত কর।

৪. 'সেই থেকে এই মাঠটার নাম হল—কচিচুষির মাঠ।' কবে থেকে ? কেন এই প্রকার নাম হল ?

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'নতুন মাটির জালাভর্তি জল ও কচিডাবের রাশি দেখে পিপাসার্ত শিরোমণিমশায় যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা এক মুহূর্তে কর্পূরের মত উড়ে গেল।'—কোন্ লেখকের লেখা কোন্ রচনা হতে অংশটি উদ্ধৃত ? অংশটির মূল বিষয় বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

২. 'মাঠের মধ্যে জলতেষ্টায় বেঘোরে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন লোক নাকি কেউ কেউ দেখেছে, একটা ছোট মেয়ে মাঠের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে বলচে—ওগো, আমি জল দেবো, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'—কোন্ লেখকের লেখা কোন্ রচনার অংশ ? বক্তা কে ? তাঁর বক্তব্য বিষয় গুছিয়ে লেখ।

৩. 'তার পৃথিবীর বালিকা-জীবনের ইতিহাস সে ভোলে নি'—কোন্ লেখকের লেখা কোন্ রচনা হতে এটি নেওয়া হয়েছে ? 'সে' নিদাঘ-মধ্যাহ্নে

এবং সন্ধ্যাবেলায় কি করে? তার পৃথিবীর বালিকা-জীবনের ইতিহাস সে ভোলেনি কেন?

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'এ মাঠটাকে এ অঞ্চলে বলে কচুচুবির মাঠ।'—কারা বলে? কেন বলে? মাঠটির বর্ণনা দাও।

২. 'মনে হতে লাগল—একটু ঘন সবুজ মত যদি কোনও পাতাও পাই তাহলে চুষি।'—কার মনে হতে লাগল? কেন মনে হতে লাগল?

৩. 'বটতলায় পৌঁছে দেখলেন একটা জলসত্র।' কে দেখলেন? জলসত্র কি? সেখানে লোকেরা কি করছে?

৪. 'তিনি নিজে এবং তাঁর বংশ চিরদিন অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী।'—কার কথা বলা হয়েছে? 'অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী' শব্দটির অর্থ কি? অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী হওয়ার জন্য 'তিনি কি করলেন?

৫. 'শিরোমণি মশায়ের বসে বসে মনে হ'ল'—কি মনে হল? তার ফল কি হল?

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. শব্দার্থ লেখ এবং বাক্যে প্রয়োগ কর: সামিল, জলসত্র, এক মুহূর্তে কর্পূরের মত উড়ে গেল, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী, ঘুরপাক, পাটভাঙা, উদরসাৎ, জলকষ্টপীড়িত, পিপাসার্ত, ঊর্ধ্বলোক।

২. পদ পরিবর্তন কর: তীব্র, তৃষ্ণা, অবসন্ন, বৈকাল, পাগলী, নিদাঘ, সমুদ্র, আগ্রহ, ভোগ, বিস্তৃত, নির্জীব, অক্ষম, প্রকাণ্ড, অনুভব, সংসার, গাছ, বন, মাঠ, প্রণাম, ক্রম, আশ্রয়, সন্ধ্যা।

৩. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: খররৌদ্র, কাপড়-চোপড়, রোদে-পোড়া, জগদ্ধাত্রী, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী, ভদ্রতাসঙ্গত, পিপাসার্ত, ঊর্ধ্বলোক মধ্যাহ্ন।

৪. সন্ধিবিচ্ছেদ কর: নির্জীব, পিপাসার্ত, পিপাসাতুর, সংসার, সংক্ষিপ্ত।

৫. প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্ণয় কর: পোড়া, আগমন, ঝিরঝিরে, অবসন্ন, উদরসাৎ, পথিক, সন্ধ্যা, ইতিহাস।

৬. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর: শিরোমণি-মশাই **শিষ্য-বাড়ি** যাচ্ছিলেন। কোথাও একটা **গাছ** পর্যন্ত নাই। তারাচাঁদ বিশ্বেস **ব্যবসা করে** বড়লোক হয়েছিল। এক ঘটি **জল** আমায় দাও।

লেখক ঃ ভাষাচার্য ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—১৯৭৭) এম. এ. ডি-লিট (লণ্ডন) বাংলার এক সুসন্তান ; মনীষী, ভাষাতত্ত্ববিদ্, প্রাবন্ধিক ও সুলেখক। ভাষাতত্ত্ববিদ্ হিসাবেই তিনি সমগ্র পৃথিবীতে সুপরিচিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য এই আচার্য পাণ্ডিত্য, গবেষণানিষ্ঠা, অমায়িক মধুর ব্যক্তিত্বের জন্য সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'দ্বীপময় ভারতে' এবং এককভাবে বহুবার ইউরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। এঁর গবেষণাগ্রন্থ Origin and Development of Bengali Language গ্রন্থটি ভাষাতত্ত্বের একটি আকর গ্রন্থ। এছাড়া বহু গ্রন্থের রচয়িতা সুনীতিকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক এবং পরে আজীবন জাতীয় অধ্যাপকের পদে বৃত ছিলেন। []

তাঁর লেখা ঃ মনীষা, পাণ্ডিত্য, ভাষাতত্ত্বে প্রভৃত জ্ঞানের অধিকারী সুনীতিকুমার একজন প্রথম শ্রেণীর গদ্যলেখক। দুরূহ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাধর্মী বিষয়কেও তিনি সহজ ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতের বাইরেও কিভাবে প্রচার ও প্রসারলাভ করেছিল এবং বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার অবদান কতখানি—এই নিবন্ধে লেখক তা সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। []

আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ, আমাদের পিতৃভূমি, আমাদের মাতৃস্বরূপিণী। এই দেশে আমাদের পিতৃপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই দেশেই তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সব বড় বড় কাজ এই দেশে করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে আমাদের এই বিরাট ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে ; ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান এ সমস্তের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা যে গৌরব অর্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বংশধর বলিয়া আমরাও সেই গৌরবের অংশীদার।

খালি ভারতবর্ষের মধ্যেই তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহারা যাইতেন এবং ভারতের বাহিরের নানা দেশেও তাঁহাদের কীর্তিকলাপ আমরা এখনও দেখিতে পাই। তাঁহারা প্রথমতঃ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এই সকল দেশে যাইতেন। তাহার পরে, এ-দেশের যোগীরা, এ-দেশের ব্রাহ্মণ ও আচার্যেরা, এ-দেশের বুদ্ধদেব মানুষের কল্যাণের জন্য যে-সব অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন, সেইসব উপদেশও ইঁহারা ভারতের বাহিরের নানা দেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। বাহিরের দেশের লোকেরা তাঁহাদের কথা শুনিল। তাহারা আদরের সঙ্গে আমাদের ঋষিদের ও ব্রাহ্মণদের ধর্ম ও উপদেশ এবং বুদ্ধদেবের উপদেশ গ্রহণ করিল। আমাদের দেশের ধর্ম ও চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরাণ-কথা ও কাহিনী, আমাদের আচার, অনুষ্ঠান, আমাদের মন্দির গঠন-প্রণালী, আমাদের শিল্প, আমাদের সংগীত ও নৃত্য, এ সমস্তও গ্রহণ করিল; এবং এগুলিকে নিজের দেশের ও রুচির অনুরূপ করিয়া একটু-আধটু অদল-বদল করিয়া, নিজেদেরও অনেক জিনিস মিশাইয়া একেবারে নিজস্ব করিয়া লইল। এইরূপে আমাদের দেশের লোকেদের সঙ্গে মিলিয়া, ভারতবর্ষের বাহিরের বহু দেশ নিজ নিজ জাতীয় সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিল, অথবা ভারতের সভ্যতা, ধর্ম, রীতি-নীতি দ্বারা নিজেদের পূর্বেকার সভ্যতাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। এই সকল দেশের কতকগুলি আবার ভারতবর্ষের সভ্যতা, ধর্ম, পুরাণকথা, শিল্প প্রভৃতিকে এতটা আপনার করিয়া লইল যে, নিজেদের দেশকে ভারতবর্ষের যেন একটা অঙ্গ বা অংশ স্বরূপ করিয়া ফেলিল।

ভারতবর্ষের বাহিরে নানা দেশে এইরূপে যে সকল নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া উঠিয়াছিল, আমরা সেগুলিকে একসঙ্গে "বৃহত্তর ভারত" বলি।

দুই হাজার বছরের আগে হইতেই এই "বৃহত্তর ভারত" গড়িতে আরম্ভ করে। এশিয়া মহাদেশের প্রধানতঃ তিনটি স্থানে "বৃহত্তর ভারত" গড়িয়া উঠিয়াছিল—সেই তিনটি স্থানের নামকরণ হইয়াছে—

'ইন্দোনেসিয়া' বা 'ইনসুলিন্দিয়া' অর্থাৎ 'দ্বীপময় ভারত', 'ইন্দোচীন' অথবা 'ভারতচীন' এবং 'সেরিন্দিয়া' অথবা 'চীনভারত'। এতভিন্ন আধুনিক আফগানিস্থান ও তিব্বতকে বৃহত্তর ভারতের মধ্যে ধরিতে হয় এবং সিংহলদ্বীপকে বৃহত্তর ভারতের অংশ অপেক্ষা মূল ভারতবর্ষেরই প্রদেশ বলিয়া ধরা উচিত।

চীন, কোরিয়া ও জাপানকে এবং কতকটা টংকিং ও আনামকে বৃহত্তর ভারতের অংশ বলা যায় না। কারণ এই দেশগুলি, বিশেষতঃ চীন, অতি প্রাচীনকাল হইতেই সুসভ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত—পার্থিব সভ্যতায় চীন ভারতের সমকক্ষ, ভগিনীস্থানীয়; কিন্তু বৃহত্তর দেশগুলিকে ভারতবর্ষের কন্যাস্থানীয় বলিতে পারা যায়। কোরিয়া, জাপান এবং টংকিং ও আনাম চীনেরই মানস-কন্যা।

ইন্দোনেসিয়া ও ইন্দোচীন—এই দুই স্থানে ভারতীয় প্রভাব খুব বেশী করিয়া হইয়াছিল,—এই দুই স্থানের লোকেদের উপর প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনও দেশের প্রভাব পড়ে নাই বলিলেই চলে।

কিন্তু 'সেরিন্দিয়া'য় ভারতীয় প্রভাব ছাড়া চীন, পারস্য ও গ্রীসের প্রভাবও খুব পড়িয়াছিল। সেরিন্দিয়া নামটি আধুনিক এশিয়ার মানচিত্রে নাই। দেশের প্রাচীন সভ্যতার কথা মনে করিয়া যে দেশকে আমরা এখন সেরিন্দিয়া বলিতেছি, সেই দেশ এখন মুখ্যতঃ রুষ-তুর্কীস্থান ও চীনা-তুর্কীস্থান এই দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। সেরিন্দিয়া নামটি গ্রীক 'সেরেস' ও 'ইণ্ডিয়া' এই দুইটি শব্দ মিলাইয়া গঠিত। চীন ও ভারত উভয় দেশের প্রভাব আসিয়া এই দেশে মিশিয়াছিল বলিয়া এই নাম।

সেরিন্দিয়া যুগের বিস্তর নগর ও বৌদ্ধ মঠমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেশের মরুভূমির বালির নীচে হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চীনারা অতি প্রাচীনকালে এই দেশ জয় করিয়াছিল, তাহাদের অধিকারের নানান নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ভারতের সভ্যতার নিদর্শন হইতেছে বৌদ্ধ ও অন্য ভারতীয় শাস্ত্রের সংস্কৃত পুঁথি, এবং দেশী ভাষায় লিখিত পুঁথি, ছবি, মূর্তি প্রভৃতি। দেশটা পূর্বে বেশ উর্বর ছিল, এখন বহু স্থান

জলশূন্য হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে ; মরুভূমির বালিতে প্রাচীন সব শহর ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সেই সব বালি খুঁড়িয়া প্রাচীন ভারতীয় ও অন্য সভ্যতার এবং স্থানীয় শিল্পকলাদির প্রচুর নিদর্শন বাহির হইয়াছে। আমরা এইসব আবিষ্কারের ফলে এবং হিউয়েন-সাঙ-প্রমুখ চীনা পরিব্রাজকগণের লেখা বই-এর বিবরণ পড়িয়া এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, ভারতের অধিবাসিগণের কি বিরাট এক সভ্যতা মধ্য এশিয়ার লোকেদের গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। ক্রমে ইহারা মধ্য এশিয়াকে ভারতের একটি অংশ করিয়া তুলিয়াছিল। এখানকার বিশিষ্ট লোকেরা সংস্কৃত নাম লইতেন। কুচা রাজ্যের একজন রাজার নাম ছিল স্বর্ণদেব। কারা-শহরে এক রাজার নাম ছিল হরিপুষ্প ও খোতানের রাজার নাম ছিল 'বিজয়'। ইঁহারা আনুমানিক ৬৩০ খৃষ্টাব্দের লোক। সেরিন্দিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তির নাম হইতেছে কুমারজীব (জীবৎকাল আনুমানিক ৩৪৪—৪১৩ খৃষ্টাব্দ)। ইনি বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং কুচা হইতে চীনে গিয়া বিস্তর বৌদ্ধ-গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল 'কুমার'। পিতা ভারত হইতে কুচায় আগত এক রাজপুত্র ছিলেন এবং ইঁহার মাতা 'জীবা' ছিলেন কুচার রাজকুমারী। মাতা ও পিতার নাম মিলিত করিয়া ইঁহার নাম। এখন এই ভূ-ভাগ আর ভারতের অংশ নহে ; কেবল প্রাচীন ভারতের—আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি ইহার ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত। এইরূপ বহু নিদর্শন এদেশের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে।

আজকাল যে দেশকে আমরা আফগানিস্থান বলি, সে দেশ দেড় হাজার বছর আগে আমাদের ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। এখন আফগানিস্থানের লোকেরা হয় ফারসী, নয় পশতু বলে। জাতিতে ইহারা ইরাণীয় আর্য, ধর্মে এখন মুসলমান ; কিন্তু তখন এই দেশের লোকেরা ছিল হিন্দুজাতীয় ; ধর্মে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি হিন্দুধর্মের শাখা মানিত। গ্রীকেরা আফগানিস্থানকে India Meion অর্থাৎ India

Minor বা 'ছোট ভারত' বা 'প্র-ভারত' বলিত। দেড় হাজার বৎসর পূর্বেও এই দেশে হিন্দুধর্মের প্রচুর নিদর্শন ছিল। কাবুল শহরের ৩০ মাইল পশ্চিমে 'বামিয়ান' বা 'ব্রহ্মযান' নামক স্থানে পাহাড়ের গা কাটিয়া তৈয়ারী কতকগুলি বিরাট বুদ্ধমূর্তি বাহির হইয়াছে, খাড়াইয়ে এক-একটা কলিকাতার মনুমেণ্টের চেয়েও উঁচু। এছাড়া মন্দির, চিত্র, মূর্তি—বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচুর নিদর্শন বাহির হইয়াছে।

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'বৃহত্তর ভারত' কাকে বলে? বৃহত্তর ভারতে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব কতখানি—এই প্রবন্ধের অনুসরণে সংক্ষেপে লেখ।

২. চীন, কোরিয়া ও জাপানকে বৃহত্তর ভারতের অংশ বলা যায় না কেন? ইন্দোনেসিয়া, ইন্দোচীন ও সেরিন্দিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব কতখানি?

৩. 'সে দেশ দেড় হাজার বছর আগে আমাদের ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল।'—কোন্ দেশের কথা বলা হয়েছে? সে দেশে ভারতীয় সভ্যতার কি পরিচয় পাওয়া যায়?

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'তাঁহারা যে গৌরব অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধর বলিয়া আমরাও সেই গৌরবের অংশীদার।' কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত? লেখক কে? উদ্ধৃত অংশটির তাৎপর্য কি?

২. 'এখন এই ভূ-ভাগ আর ভারতের অংশ নহে; কেবল প্রাচীন ভারতের—আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি ইহার ভূ-গর্ভ হইতে প্রাপ্ত।'—কোন্ রচনার অন্তর্গত? লেখক কে? উদ্ধৃত অংশটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'খালি ভারতবর্ষের মধ্যেই তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল না।'—কাদের কথা বলা হয়েছে? ভারতের বাইরে কোন্ কোন্ স্থানে তাঁদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ছিল?

২. 'নিজেদের দেশকে ভারতবর্ষের যেন একটা অঙ্গ বা অংশ স্বরূপ করিয়া ফেলিল।'—কোন্ দেশের কথা বলা হয়েছে? কিভাবে এসব দেশ নিজেকে ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ বা অংশ স্বরূপ করে ফেলেছিল?

৩ 'পার্থিব সভ্যতায় ভারতের সমকক্ষ, ভগিনীস্থানীয়; কিন্তু বৃহত্তর দেশগুলিকে ভারতবর্ষের কন্যাস্থানীয় বলিতে পারা যায়।'—চীনকে ভারতের ভগিনীস্থানীয় এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে ভারতের কন্যাস্থানীয় বলবার কারণ কি ?

৪. সেরিন্দিয়া যুগের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ার পর কি কি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে ? এই সভ্যতার উপর ভারতবর্ষের প্রভাব কতখানি পড়েছিল ?

৫. স্বর্ণদেব, বিজয়, কুমারজীব, জীবা · এঁদের সম্পর্কে কি জানো ?

৬ 'ছোট ভারত' বা 'প্র-ভারত' কোন্ দেশকে বলা হত ? সে দেশ যে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল তার প্রমাণ কি ?

৭. টীকা লেখ : হিউয়েন সাঙ, হরিপুষ্প, ব্রহ্মযান।

● **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর : নির্বাহ, উদ্ভাবনী, অর্জন, বংশধর, কর্মক্ষেত্র, কীর্তিকলাপ, আচার্য, অমূল্য, এতদ্ভিন্ন, সমকক্ষ, মানস-কন্যা, প্রভাব, ধ্বংসাবশেষ, অদল-বদল, নিদর্শন, গ্রাস, ভূ-গর্ভ।

২. পদ পরিবর্তন কর : উদ্ভাবনী, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ঋষি, সংগীত, উপদেশ, সমৃদ্ধ, শিল্প, প্রদেশ, অংশ, পার্থিব, মানস, প্রভাব, প্রাচীন, বিভক্ত, আবিষ্কৃত, পরিণত, বিশিষ্ট, বৌদ্ধ জৈন, পণ্ডিত, অনুষ্ঠান, উর্বর, প্রচুর, ব্রাহ্মণ্য।

৩. বিপরীতার্থক শব্দ লেখ : সৃষ্টি, কল্যাণ, অমূল্য, নিজস্ব, সমৃদ্ধ, বৃহত্তর, উচিত, আবিষ্কৃত, প্রচুর, বিশিষ্ট, পণ্ডিত, অর্জন, গ্রহণ, কন্যাস্থানীয়, বাহির, প্রাচীন।

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ কর : উদ্ভাবনী, ধ্বংসাবশেষ, আবিষ্কৃত, সংস্কৃত, এতদ্ভিন্ন।

৫. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : সীমাবদ্ধ, কীর্তিকলাপ, অদল-বদল, পুরাণকথা, সিংহলদ্বীপ, সুসভ্য, মানসকন্যা, ধ্বংসাবশেষ, জলশূন্য, পূর্বপুরুষ, ভূ-গর্ভ।

৬. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর : উদ্ভাবনী, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সৃষ্টি, গ্রহণ, কন্যাস্থানীয়, গঠিত, আনুমানিক, প্রাপ্ত, স্মৃতি, নিদর্শন।

৭. শূন্যস্থান পূরণ কর : এগুলিকে — দেশেরও — অনুরূপ করিয়া একটু-আধটু —— করিয়া, নিজেদেরও অনেক জিনিস — একেবারে—করিয়া লইল।

সাহারা অভিযান

প্রবোধ কুমার সান্যাল

লেখক : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭—১৯৮৪) একটি বিশিষ্ট নাম। শুধু গল্প-উপন্যাস নয়, ইনি ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা প্রভৃতিও লিখেছেন। ভ্রমণকাহিনী রচনায় এঁর দক্ষতা সর্বজনবিদিত এবং বিশেষভাবে প্রশংসিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই লেখকের লেখা পড়ে তাঁর 'রচনা ও কল্পনাশক্তির' প্রশংসা করেছিলেন। লেখকের কয়েকটি বিখ্যাত গল্প-উপন্যাসের নাম—নিশিপদ্ম, প্রিয়বান্ধবী, আঁকাবাঁকা, হাস্যবানু, নদ ও নদী প্রভৃতি। প্রথম ভ্রমণ-গল্প 'মহাপ্রস্থানের পথে' লেখকের সবচেয়ে সমাদৃত বই। এঁর 'দেবতাত্মা হিমালয়' ও 'বনস্পতির বৈঠক'ও উচ্চশ্রেণীর রচনা। []

তাঁর লেখা : প্রবোধকুমার সান্যালের লেখার বড়ো গুণ তাঁর সাবলীল ও গতিময় ভাষা। বর্ণনা ও বিবরণদানেও তাঁর দক্ষতা অতুলনীয়। ভাষায় কাব্যময়তা আরো একটি বিশিষ্ট গুণ। ভ্রমণমূলক রচনায় এইসব বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। সংকলিত 'সাহারা অভিযান' রচনাটিতে লেখকের রচনাভঙ্গির সমস্ত গুণগুলিই খুঁজে পাওয়া যায়। সাহারা মরুভূমির বর্ণনা, সেই ভয়ঙ্কর সাহারা অভিযানের শ্বাসরোধকারী কাহিনী লেখকের সজীব বর্ণনা ও চমৎকার ভাষাগুণে অতিশয় উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বলতে বাধা নেই, বাংলা সাহিত্যে এ-ধরনের লেখা খুব-একটা বেশি চোখে পড়ে না। []

॥ ১ ॥

মরুময় সাহারা। আদি-অন্তহীন বিপুল সাহারা—কোথাও জল নেই, ছায়া নেই, লোকালয় নেই—কোমল সবুজ রঙের গাছপালা, দূর্বাদল, শান্ত স্নিগ্ধ সরোবর—কোথাও কিছু নেই। শুধু বালু আর বালু! যতদূর দৃষ্টি যায়, মানুষের কল্পনা যতদূর চলে—হাজার হাজার মাইল—শুধু জলহীন, জনহীন মরুপ্রান্তর—শুধু চিতার আগুন হা হা ক'রে জ্বলছে—যুগযুগান্তর ধরে দাউ-দাউ হাউ-হাউ ক'রে জ্বলছে।

এর নাম সাহারা।

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরে ভূভাগ—পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর, পূর্বদিকে হাব্‌সীদের দেশ—এদের মাঝখানে হাজার হাজার মাইলব্যাপী সাহারা মরুভূমি। এই বিশাল ভূভাগের কর্তা কে, এদেশ কা'র অধীনে, কারা রাজত্ব করে, কাদের কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হয়—এ আজও নিশ্চিতভাবে স্থির হয়নি।

সাহারা দুর্গম দুর্জয়! সাহারা কোন কালে মনুষের বশ্যতা স্বীকার করেনি। সাহারা সকল মানুষের শাসনের অতীত।

তবু মানুষের বহুকালের চেষ্টায় সাহারার উত্তর ভাগের অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ কিনারায় কিছু-কিছু লোক-বসতি গ'ড়ে উঠেছে। সেই ভূভাগগুলির নাম দেওয়া হয়েছে—আলজিরিয়া, মরক্কো, টিউনিসিয়া, লিবিয়া ইত্যাদি। বলতে গেলে মিশরদেশ ও সুদানও সাহারার অন্তর্গত।

কিন্তু যে বিরাট সাহারা আজও অপরাজেয় রয়ে গেছে, তার চেহারা ভয়ঙ্কর। সেখানে হলুদ বর্ণের অনন্ত বালু-প্রান্তরের ওপর ধূসর আকাশে অনাবৃত সূর্য জ্বলছে দাউ-দাউ ক'রে। কোথাও মেঘ নেই, ঋতু পরিবর্তন নেই, শ্যামশ্রী নেই! সেই বিশাল মরুসাগরে কেবল উটের শুকনো কঙ্কাল আর সেই সব মানুষের কঙ্কাল এখানে ওখানে ছড়ানো—যাদের বুক জলের তেষ্টায় একদিন ফেটে খান্‌ খান্‌ হয়ে গেছে! বালুর ঝড় সেই সব মানুষ আর পশুর কঙ্কাল আর মাথার খুলির মধ্যে ঢুকে এখনও সাঁ-সাঁ করে। দূরে দেখা যায় মরীচিকার নীলাভ ছায়া—কত উন্মত্ত ভ্রমণকারীকে জলের লোভ দেখিয়ে ওই সর্বনাশিনী ছায়ামূর্তি মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে গেছে!

তারপর বালুর ঝড়! সেও সাংঘাতিক, সেও সর্বনাশা। এমন প্রায়ই ঘটে থাকে—একটি উটের দল চলেছে যাত্রীদের নিয়ে—সহসা বালুর সমুদ্রে ঝড় উঠলো—ঘূর্ণি ঝড়ের সেই আক্রমণে দিশেহারা হয়ে সবাই বালুর মধ্যে তলিয়ে গেল। চিরদিনের জন্য তারা নিশ্চিহ্ন হোলো। ঝড় থেকে যদি কেউ বাঁচলো, সে হয়তো তার প্রিয়তম বন্ধু উটটিকে

নিয়ে চললো এগিয়ে—অনেক আশা নিয়ে, অনেক আশ্বাস নিয়ে। কিন্তু সেই উটের পাকস্থলীতে যদি একটুখানি জল অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেই উট একসময়ে শুয়ে পড়ে, ধীরে ধীরে মরে যায়। উটের মৃত্যুর পর তার চালকের আর রক্ষা থাকে না—তাকে কাঁদতে কাঁদতে এক সময় মরতেই হবে। উটের মৃত্যু মানেই তার মৃত্যু।

এছাড়াও বিপদ আছে। হয়ত দস্যুর দল এসে আক্রমণ করলো নিরীহ যাত্রীদের। তারা খাদ্য, অর্থ, জল ও উট—সব কেড়ে নিল। যাত্রীরা সেই মরুভূমির মাঝখানে সূর্যের আগুনে পোকার মত ঘুরে ঘুরে হয়ত মরে গেল।

॥ ২ ॥

গত শতাব্দীতে একদল লোক অনেক রকম বুদ্ধি ধার করলো। তারা ভাবলো, সাহারার মধ্যে কয়েকটি নদী বইয়ে আনলে বালুকাময় ভূভাগকে উর্বর করে তোলা যেতে পারে। কোনো দল ভাবতে বসলো, দূরের আকাশ থেকে জলভরা মেঘের দল উড়িয়ে আনতে পারলে কাজ হবে। আর একদল ভাবলো, আচ্ছা, অতলান্তিক সমুদ্র থেকে যদি একটা মস্ত বড় খাল কেটে ভিতরে আনা যায়, তাহলে কেমন হয়? খাল কেটে জল এনে মরুভূমির নীচু জায়গাগুলোয় বড়-বড় জলাশয় সৃষ্টি করতে পারলে কাজ এগোতে পারে।

কিন্তু এই অনুর্বর ভূভাগের মধ্যে জিনিসপত্র, সাজ-সরঞ্জাম অথবা লোকজনের আনাগোনা চালাতে গেলে রেলপথ নির্মাণ করা আগে দরকার। তখনই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। যারা সাহারা জরিপ করবে, তারা স্থির করলো, আলজিরিয়ার ভিতর দিয়েই অভিযান করা সব চেয়ে সোজা। কর্ণেল ফ্ল্যাটার্স নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী তাঁর দলবল নিয়ে প্রস্তুত হলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় কর্ণেল ফ্ল্যাটার্স লোক সমারোহ সঙ্গে নিয়ে ওয়ারগ্রা নামক শহরের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গে চললেন দু'জন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার, কয়েকজন

সামরিক কর্মচারী, একজন ডাক্তার, সাতচল্লিশজন বন্দুকধারী, একত্রিশ জন আরব স্বেচ্ছাসেবক,—আর সাতজন পথ-প্রদর্শক এবং একজন মুসলমান পুরোহিত। শুভদিনে শুভক্ষণে আনন্দ-কলরবের ভিতর দিয়ে কর্ণেল ফ্ল্যাটার্সের দলটি মরুপথে যাত্রা করলো।

উটের বাহিনী চলেছে সাহারার ভিতর দিয়ে। কত দিন যায়, কত রাত যায়। সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জল আছে, খাদ্য আছে, যন্ত্রপাতি আছে। রাতে প্রবল ঠাণ্ডা পড়ে হাত-পা জমে যায়—অভিযানকারীরা তাঁবু খাটিয়ে ঘুমোয়। দিনের বেলায় আবার তারা চলে। সূর্যের সংঘাতিক আলো, প্রচণ্ড উত্তাপ,—দিক্‌দিগন্ত সেই আগুনে আর বালুতে ধূ-ধূ করে। তারা এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে তারা জরিপ করে, পথের পরিমাণ হিসাব ক'রে প্ল্যান আঁকে। আবার চলে।

এমনি ক'রে তিন মাস কাটলো।

কিন্তু ঠিক তিনমাস পরে সহসা বিপদের করালমূর্তি তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো—তারা শিউরে উঠলো!

সেই ঘটনাটাই বলবো।

॥ ৩ ॥

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কর্ণেল ফ্ল্যাটার্স আউ পর্বতের দিকে এগিয়ে চললেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ম্যাসন, গুইয়ার এবং আরও দু'জন ইঞ্জিনীয়ার। তাঁরা নির্ভয়ে এগিয়ে চলছিলেন। চলতে চলতে তাঁরা এসে পৌঁছলেন বির-এল-ঘরামা নামক একটি কূয়ার কাছাকাছি। এমন সময় সহসা পিছন থেকে তুয়াগ দস্যুর দল তাঁদের আক্রমণ করে। ঠিক সেই সময় তাঁদের সঙ্গের উটগুলিকে জল খাওয়ানো হচ্ছিল—সেই উটগুলির উপর দসুরা এসে পড়ে। দস্যুরা একে একে উটগুলিকে হত্যা করে। তারপর হত্যা করে তাদের ত্রিশ জন চালককে—তার সঙ্গে একজন ফরাসীকে।

এই ভয়াবহ সংবাদ তাঁবুতে এসে পৌঁছলো রাতের দিকে। তখনই কর্মচারীরা একটি বৈঠকে সমবেত হোলো। চারিদিকে আতঙ্ক ঘনিয়ে

এসেছে। যে কোন মুহূর্তে তুরাগ দস্যুরা এসে তাঁবু আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং সেই মুহূর্তে ঠিক হোলো, পালাতে হবে। না পালালে অবশিষ্ট ব্যক্তিদেরও প্রাণ হারাতে হবে।

তখনই বাক্সগুলি খোলা হোলো। খাদ্য, অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র ভাগাভাগি করা হোলো। যে যেমন পারলো জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে সেই রাত্রির অন্ধকারে সেই বিশাল মরুভূমির পথে বেরিয়ে পড়লো।

সঙ্গে উট নেই, খাদ্য কম, জলের থলি কাঁধে নিয়ে চলছে ওদের মধ্যে যারা বলবান। পদে পদে দস্যুভয়,, বালুর ঝাপ্‌টা, রোদের যন্ত্রণা —তবু তারা সেই বিভীষিকাময় জলহীন মরুভূমিতে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চললো। অন্ততঃ সুদীর্ঘ দু'মাস এইভাবে তাদের হেঁটে যেতেই হবে।

দু'মাস! দু'মাস ধরে এই পথের যন্ত্রণা কি তারা সইতে পারবে? কে জানে? তবু তারা চলেছে—লুটিয়ে লুটিয়ে চলেছে। কিন্তু এভাবে চলতে গিয়েও কি নিরাপদে যাবার যো আছে? তুরাগ দস্যুরা তাদের পিছু নেয়, তাদের ভয় দেখায়, অনেক সময় জল ও খাবার কেড়ে নেয়—ভুল পথ দেখিয়ে দেয়। কখন এসে অকারণ গায়ে পড়ে মারধোর আরম্ভ ক'রে দেয়।

এইভাবে কিছুদিন যাবার পর তুরাগ দসুরা এক সময় ভালো মানুষের মতো এসে বলে, এসো,তোমাদের সঙ্গে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করবো! ভালো কথা! কী ব্যবসা করবে? তুরাগরা বললে, আমাদের দেশের খেজুর খুব ভালো। তোমরা আমাদের কাছ থেকে খেজুর কিনবে।

ফরাসীরা সানন্দে রাজী হয়ে গেল। তারা তখন খাদ্যের অভাবে উপবাস করছিল, সুতরাং সরল মনে তুরাগদের কাছ থেকে তারা খেজুর কিনলো।

খেজুর খেতে খেতে কয়েকজন-এর উন্মাদনা আর উত্তেজনা বেড়ে গেল। কেউ ছুটে বেড়াতে লাগলো, কেউ ঘুরতে লাগলো বোঁ-বোঁ করে, কেউ পাগল হয়ে ছটফট করে, কেউ চীৎকার ক'রে প্রলাপ বকতে থাকে, কেউ বা উন্মাদের মতো ডিগ্‌বাজি খায়। ভীষণ, ভীষণ তাদের অবস্থা!

চীৎকার ক'রে কেউ কাঁদতে বসলো, কেউ তার পোষাক-আসাক ছিঁড়ে কুটি-কুটি করতে লাগলো, কেউ নিজের গলায় দড়ি বেঁধে আত্মহত্যার চেষ্টা করলো।

অবশেষে কোন মতে গরম জল গিলিয়ে সেই লোকগুলিকে কতকটা শান্ত করা গেল – কিন্তু তাদের বাঁচবার কোন আশা ছিল না। ওদের মধ্যে যারা সেই বিষাক্ত খেজুর স্পর্শ করেনি তারা অর্থাৎ আরব স্বেচ্ছাসেবকরা এই দৃশ্য দেখে এতই আতঙ্কিত হয়েছিল যে, তারা একদিন দলপতিকে না জানিয়ে গোপনে পালিয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

আবার এই উৎপীড়িত যন্ত্রণা-জর্জর ফরাসী অভিযানকারীর দলটি চললো ধীরে ধীরে হাতড়ে-হাতড়ে। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য, মরুভূমিতে কোথাও ছায়া নেই, বালুতে দ্রুত চলা যায় না—উত্তপ্ত বালু—জল নেই, আশ্রয় নেই, আহার্য নেই,—তবু তারা চললো। কারণ থামলেই তাদের নিশ্চিত মৃত্যু—কোথাও থামলে আর তারা উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

অবশেষে তারা এক সময় একটি জলাশয়ের কাছে এসে পৌঁছালো। কিন্তু এসে দেখলো, ইতিমধ্যেই সেই জলাশয়টি একদল বেদে এসে অধিকার করে বসেছে। তারা মরিয়া হয়ে উঠলো। ফলে দুই দলে যুদ্ধ বেধে গেল। যুদ্ধ থামবার পর দেখা গেল বেদের দল পালিয়েছে বটে, কিন্তু তাদের পক্ষে মারা গেছে অনেকে। যারা রক্ষা পেয়েছে তাদের জন্য আরো কোন ভয়াবহ দুর্ভাগ্য প্রতীক্ষা করছিল কি না কে জানে।

অনেক দুর্যোগের পর তুরাগদের দেশের সীমানা তারা এক সময় পার হোলো। এতদিন পরে অত্যাচার আর উৎপীড়নের হাত থেকে তারা বাঁচলো। কিন্তু পেটের ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা যে ভয়ঙ্কর। এর হাত থেকে বাঁচবার কোন উপায় ছিল না। তাদের মধ্যে এক-একজন ক'রে সেই অগ্নিগর্ভ বালুর উপর মুখ থুবড়ে পড়তে লাগল।

মৃত, রুগ্ন, মুমূর্ষু চারটি বন্দুকধারী লোক শেষ অবধি বাঁচলো। ৪ঠা এপ্রিল তারিখে তারা বালুর উপর গড়াতে গড়াতে এসে পৌঁছালো—একদিন যেখান থেকে তারা যাত্রা করেছিলো। তারা এসে খবর দিল, তিনটি লোক পিছনের মরুভূমিতে পড়ে এখনো শ্বাস টানছে, ছুটে গেলে তাদের উদ্ধার করা যেতে পারে। খবর পেয়ে রিলিফ পার্টির কয়েকটি লোক ছুটলো।

পাঁচ মাস আগে অষ্টাশিজন লোক অভিযান করেছিল মরুভূমিতে—আশায়, আনন্দে, স্বাস্থ্যে, উৎসাহে তারা ছিল উজ্জ্বল। আজ তাদের মধ্যে সাতটি লোক ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। সেই মরু-অভিযান এমন শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হবে, একথা কেউ কখনো ভাবেনি।

সাহারা! আদি অন্তহীন অনন্ত মরুভূমি সাহারা—আজও বুকের জ্বালায় দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। তার এপার থেকে ওপার অবধি রেলপথ নির্মাণের কল্পনা আজও সভ্য মানুষ ত্যাগ করেনি; কিন্তু কে যাবে সেই মৃত্যুলোকে? কোন্ বীর? কেউ জানে না। যদি কেউ যায় তবে হয় তা'র ভাগ্যে নিশ্চয় মরুসমাধি, নয়তো গর্ব ও গৌরবের জয়টিকা! সে ভাগ্যবান কে?

অনুশীলনী

বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. সাহারা কোথায় অবস্থিত? এর বিস্তার কিরূপ? মানচিত্রে এর চতুঃসীমায় কোন্ কোন্ দেশ বা মহাসাগর আছে বল।

২. সাহারার ভূ-প্রকৃতির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। প্রসঙ্গত মরীচিকা বালুঝড় ইত্যাদিরও উল্লেখ কর।

৩. কর্ণেল ফ্ল্যাটার্সের অধিনায়কত্বে সাহারা মরুভূমিতে যে অভিযান হয়েছিল তা বর্ণনা কর।

৪. "কিন্তু ঠিক তিন মাস পরে সহসা বিপদের করালমূর্তি তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো—তারা শিউরে উঠলো"—কোন্ বিপদের করালমূর্তি কিভাবে তাঁদের সামনে দাঁড়াল ও তার পরিণাম কি হল, সংক্ষেপে বল।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'সাহারা দুর্গম, দুর্জয়! সাহারা কোন কালে মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে নি। সাহারা সকল মানুষের শাসনের অতীত।'—কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অন্তর্গত এটি? সাহারা মরুভূমি কেন দুর্গম ও দুর্জয় শাসনের অতীত বুঝিয়ে বলো।

২ 'যদি কেউ যায় তবে তার ভাগ্যে হয় নিশ্চয় মরুসমাধি, নয়ত গর্ব ও গৌরবের জয়টিকা! সে ভাগ্যবান কে?'—কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অংশ এটি? অজেয় সাহারা মরুভূমিকে জয় করা সম্পর্কে লেখকের এই মন্তব্য বিশ্লেষণ কর।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'এমনি করে তিন মাস কাটলো।'—কেমন করে তিন মাস কাটলো ?

২. 'তাঁরা নির্ভয়ে এগিয়ে চললেন।'—কারা, কোথায় এগিয়ে চললেন ? তাঁদের লক্ষ্য কি ?

৩. 'আমাদের দেশের খেজুর খুব ভালো।'—একথা কারা, কাদের বলেছিল ? তাদের 'ভালো' খেজুর খেয়ে মরু-অভিযাত্রীদের কি অবস্থা হয়েছিল ?

৪. 'একথা কেউ ভাবেনি।'—কোন্ কথা ? কি ভাবা হয়েছিল আর ফলই বা কি হয়েছিল ?

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. শব্দার্থ লেখো এবং বাক্যে প্রয়োগ কর : বিপুল, লোকালয়, ভূ-ভাগ, নিয়ন্ত্রিত, বশ্যতা, অপরাজেয়, অনাবৃত, শ্যামশ্রী, ছায়ামূর্তি, নিশ্চিহ্ন, আক্রমণ, উর্বর, জলাশয়, অনুর্বর অবসরপ্রাপ্ত, স্বেচ্ছাসেবক, পুরোহিত, সাংঘাতিক, করালমূর্তি, সমবেত, বিভীষিকাময়, উপবাস, প্রলাপ, উন্মাদ, আতঙ্কিত, উৎপীড়িত, যন্ত্রণা-জর্জর, মরিয়া, প্রতীক্ষা, মুমূর্ষু, শোচনীয়, জয়টিকা।

২. পদ পরিবর্তন কর : বিপুল, কোমল, কল্পনা, নিয়ন্ত্রিত, বশ্যতা, মৃত্যু, ঝড়, সূর্য, উর্বর, সমুদ্র, পুরোহিত. আক্রমণ, দস্যু, হত্যা, বৈঠক, বিশাল, বাণিজ্য, উপবাস, উন্মাদনা, উত্তেজনা, উৎপীড়িত, নিশ্চিত. প্রতীক্ষা, মুমূর্ষু, শোচনীয়, নির্মাণ. গর্ব।

৩. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : বিপুল, স্থির, স্বীকার. অপরাজেয়, অনাবৃত, প্রিয়তম, অবশিষ্ট, উর্বর, সামরিক, উত্তাপ, বিপদ, নির্ভয়ে, ভালো মানুষ, রাজী, নিশ্চিত, দুর্ভাগ্য, অনন্ত, মৃত্যুলোক।

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ কর : লোকালয়, যুগান্তর, অন্তর্গত, উন্মত্ত, উজ্জ্বল।

৫. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : লোকালয়, সরোবর, জলহীন, লোক-বসতি, অনাবৃত, শ্যামশ্রী, ছায়ামূর্তি, স্বেচ্ছাসেবক. শুভক্ষণ, করালমূর্তি, আত্মহত্যা, অগ্নিগর্ভ, জলাশয়, বন্দুকধারী. মৃত্যুলোক।

৬. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর : মরুময়, নিমন্ত্রিত, অন্তর্গত, অবশিষ্ট, চালক, বুদ্ধি, অভিজ্ঞ, হত্যা, বলবান. মুমূর্ষু, কল্পনা, নির্মাণ।

প্রাচীন ভারতের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য

নীহার রঞ্জন রায়

লেখক ঃ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সাম্প্রতিককালের একজন স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রথিতযশা অধ্যাপক, গবেষক, রবীন্দ্রানুরাগী এবং সুলেখক। এঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে বাঙালীর ইতিহাস, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। []

তাঁর লেখা ঃ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ইতিহাসের অধ্যাপক এবং ঐতিহাসিক। তাঁর লেখা 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থটি প্রাচীন বাংলার কৃষি শিল্প বাণিজ্য এবং সংস্কৃতির এক অসামান্য, প্রামাণ্য ও গবেষণা-নিষ্ঠ ইতিহাস। আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখকের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। এই অংশে প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি—কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের একটি গৌরবময় আলেখ্য ফুটে উঠেছে। বিদগ্ধ লেখকের উজ্জ্বল, সংহত ও লক্ষ্যভেদী ভাষা ও বাক্যবিন্যাসে ইতিহাসের বিষয়টি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ভাষায় কাঠিন্য আছে, কিন্তু নীরসতা নেই। এ ধরনের রচনা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। []

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতক পর্যন্ত গাঙ্গেয় ও প্রাচ্য ভারতবর্ষের প্রধান ধনোৎপাদন উপায় ছিল কৃষি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ও যৌথ গৃহশিল্প এবং কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য। খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতেই ভারতবর্ষের সর্বত্র সামাজিক ধন উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া, জীবনধারণের মান উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে

ভারতবর্ষ যথার্থতঃ সোনার ভারতে পরিণতি লাভ করে; এই দুই শতাব্দী জুড়িয়া যথার্থতঃ এবং আক্ষরিক অর্থে ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগের বিস্তৃতি। এই বিবর্তন-পরিবর্তনের প্রধান কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি; বস্তুতঃ, এই কয়েক শতক ধরিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমবর্ধমান, এবং এই ব্যবসা-বাণিজ্যই সামাজিক ধনোৎপাদনের প্রধান সহায়। বস্তুতঃ, খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত সুবিস্তৃত রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সামুদ্রিক বাণিজ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। তাহার আগেও বহু শতাব্দী ধরিয়া পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে জলপথে ভারতবর্ষের একটা বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, এই দেশগুলিতে ভারতীয় নানা দ্রব্যাদির চাহিদাও ছিল, কিন্তু বাণিজ্যটা প্রধানতঃ ছিল আরব বণিকদের হাতে। কিন্তু মোটামুটি ৫০ খ্রীষ্ট তারিখ হইতে নানা কারণে রোম সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে এই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইবার সুযোগ লাভ করে, দেশে ধনাগমের একটি স্বর্ণদ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়। বস্তুতঃ এই বাণিজ্য ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে আমাদের দেশ এত লাভবান হইতে আরম্ভ করে, এত রোমক সোনা বহিয়া আসিতে আরম্ভ করে যে দ্বিতীয় শতকে ঐতিহাসিক প্লিনি অত্যন্ত দুঃখে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে ভাবে ভারতবর্ষে সোনা বহিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এ-ভাবে বেশিদিন চলিলে সমস্ত রোমক সাম্রাজ্য স্বর্ণহীন, রক্তহীন হইয়া পড়িবে। সিন্ধুদেশের সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গা-বন্দর ও তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত সমস্ত উপকূল বাহিয়া কুড়িটিরও বেশি ছোট বড় সামুদ্রিক বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যে পনিবেশ। এইসব বন্দর, বিশেষভাবে পশ্চিম ভারতের ভৃগুকচ্ছ, সুরাষ্ট্র, কল্যাণ প্রভৃতি বন্দর আশ্রয় করিয়া জাহাজে রোমক সোনার স্রোত বহিয়া আসিত ভারতবর্ষের সর্বত্র। বস্তুতঃ, পশ্চিম-ভারতের এই স্বর্ণদ্বারের অধিকার লইয়াই তো শক-সাতবাহন সংগ্রাম, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পশ্চিম-ভারত অভিযান, স্কন্দ-গুপ্তের বিনিদ্র রজনী যাপন। দক্ষিণ ভারতের দ্বার ছিল অনেক,

কাজেই দুর্ভাবনার কারণ ছিল না, কিন্তু উত্তর-ভারতের প্রধান পথ ঐ গুজরাটের বন্দরগুলি, আর স্বল্পাংশে গঙ্গা ও তাম্রলিপ্তি বন্দর। এই বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যলব্ধ স্বর্ণই গুপ্ত আমলের স্বর্ণ-যুগের ভিত্তি। এবং এই সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মনন ও কল্পনা, ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা ও সাহিত্যে ভারতীয় জীবনের যে বিস্তৃতি, বৃহত্তর গভীরতর জীবনের যে আস্বাদন তাহার মূলেও যে বহুলাংশে এই স্বর্ণ বা সামাজিক ধন তাহাও স্বীকার করিতে হয়। এই সুবৃহৎ বাণিজ্যই বৃহৎ ও গভীর চেতনা সঞ্চারের মূলে। জীবনধারণের মানকে উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ করিবার মূলে ; এই মান উন্নত না হইলে, চেতনা সঞ্চারিত না হইলে সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত হয় না।

শুধু এই সামুদ্রিক বাণিজ্যই নয়। বহু প্রাচীন কাল হইতেই উত্তর-পূর্ব চীনের পূর্বতম সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি পার হইয়া পামীরের উত্তুঙ্গপৃষ্ঠ বাহিয়া আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ইরান-দেশ অতিক্রম করিয়া একেবারে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ আন্তর্দেশীয় প্রান্তাতিপ্রান্ত পথ সেই পথ দিয়া একটা বৃহৎ বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পশ্চিমাভিযানের ফলে ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম এই পথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং তাহার কিছুদিন পর হইতেই নানা বিদেশী বণিককুলের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে ভারতবর্ষ ধনাগমের এক নূতন পথ খুঁজিয়া পায়। খ্রীষ্টপূর্ব ও খ্রীষ্টোত্তর প্রথম-দ্বিতীয় শতকে শক-কুষাণ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে এই পথ বিস্তৃততর এবং বাণিজ্য গভীরতর হয় এবং তাহার ফলে দেশে স্বর্ণপ্রবাহের আর একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়। পঞ্চম শতকে হূণাভিযানের পূর্ব পর্যন্ত এই দ্বার উন্মুক্তই ছিল, কিন্তু হূণেরা মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের এই সম্বন্ধ বিপর্যস্ত করিয়া দেয়।

এই সুবিস্তৃত ও সুপ্রচুর লাভজনক বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যই প্রত্যক্ষ ভাবে দেশের শিল্পকে, বিশেষভাবে দেশের বস্ত্র ও গন্ধশিল্পকে, দন্ত ও কাষ্ঠশিল্পকে অগ্রসর করিয়া দেয়, কোনো-কোনো কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইয়া কৃষিকেও অগ্রসর করে। এই সবের ফলে বাণিজ্যলব্ধ

ধন সমাজের নানা স্তরে বণ্টিত হইতে আরম্ভ করে, এবং সাধারণ কৃষক এবং গ্রামবাসী গৃহস্থেরও জীবনের মান অনেকাংশে উন্নত হয়। সাধারণ গৃহস্থের ভাণ্ডারেও স্বর্ণমুদ্রা এই যুগেরই সামাজিক লক্ষণ।

এই সুবিস্তৃত বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, এই কয়েক শতাব্দী জুড়িয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ; বিশেষতঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই এই সুবর্ণমুদ্রা একেবারে নিকষোত্তীর্ণ খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা, এবং তাহার ওজন বাড়িতে বাড়িতে প্রথম কুমারগুপ্তের আমলে একেবারে চরম শিখরে উঠিয়া গিয়াছে ; ধাতবমূল্যে শিল্পমূল্যে, আকৃতি-প্রকৃতিতে এই মুদ্রার সত্যিই কোনো তুলনা নাই। এই কয়েক শতকের রৌপমুদ্রা সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। এই সুবর্ণমুদ্রার ও রৌপ্যমুদ্রার নাম যথাক্রমে দীনার ও দ্রক্ষ। আর, এই যুগে নগর-সভ্যতার বিস্তার ও সমৃদ্ধ নাগরিক আদর্শের যে পরিচয় বাৎস্যায়নের কামসূত্রে দেখিতেছি তাহা প্রত্যক্ষভাবে এই সামাজিক ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

উত্তর-ভারতের প্রত্যন্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও এই সুবৃহৎ বৈদেশিক বিশেষভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ অন্যতম অংশীদার হইয়াছিল, এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ সামাজিক ধনের কিছুটা অধিকার লাভ করিয়াছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি বাংলার সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ; খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের আগে হইতেই এই বন্দরদ্বয়ের কথা নানা সূত্রে শোনা যাইতেছে। আমদানী-রপ্তানীর খবরও পাওয়া যাইতেছে। বাংলাদেশ, বিশেষভাবে উত্তর বঙ্গ গুপ্তাধিকারে আসিবার পর হইতেই বৃহত্তর ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার যোগসূত্র আরও ঘনিষ্ঠ হয় এবং এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ক্রমশঃ আরও বাড়িয়াই চলে। বস্তুতঃ, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে দেখিতেছি উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে গ্রামের সাধারণ গৃহস্থও ভূমি কেনাবেচা করিতেছেন স্বর্ণমুদ্রায়। স্বর্ণমুদ্রাই যে এ-যুগের মুদ্রাযান এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। তাহা ছাড়া, বাংলাদেশের সর্বত্র এই যুগে দেখিতেছি, শাসনাধিকারগুলিতে রাজপাদোপজীবী ছাড়া আর যে তিনজন থাকিতেন

তাঁহাদের একজন নগরশ্রেষ্ঠী, একজন প্রথম সার্থবাহ, একজন প্রথম কুলিক, অর্থাৎ প্রত্যেকেই শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি। সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যকে কতখানি মুল্য দিত তাহা এই তথ্যে সুস্পষ্ট।

বস্তুতঃ, কিছুটা পরিমাণে কৃষিনির্ভরতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ও বাংলার এই কয়েক শতকের সমাজ প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-নির্ভর, অর্থাৎ ধনোৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপায় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি অন্যতম উপায় মাত্র। তাহা ছাড়া, যেহেতু বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাই ছিল বেশি, সেইহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ অর্থ শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহকুল এবং রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরও মোটামুটি একটা বৃহৎ অংশ শিল্পীকুলের হাতেও গিয়া পৌছিত। অধিকন্তু, গ্রামবাসী গৃহস্থের ভূমি কেনা-বেচায় স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, গৃহপতি এবং কৃষকসমাজেও উৎপাদিত ধনের কিছু অংশ আসিয়া পড়িত। ইহার প্রত্যক্ষ ফল জীবনধারণের মানের উন্নতি ও প্রসার এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি।

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. প্রাচীন ভারতবর্ষ বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যে উন্নতি করবার ফলে দেশে যে বিপুল সমৃদ্ধি ও নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটেছিল তার বিস্তৃত বিবরণ দাও।

২. সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যতীত প্রাচীন ভারতবর্ষে আর কিভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তৃত হয়? এর ফল কি হয়েছিল?

৩. প্রাচীন যুগে বাংলাদেশের কিরূপ উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল তা বিবৃত কর।

৪. 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস'।—এই রচনাটি অবলম্বন করে উক্তিটির যাথার্থ্য নির্ণয় কর।

৫. এঁদের পরিচয় দাও: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, প্লিনি, বাৎস্যায়ন।

● **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী**

১. 'যে ভাবে ভারতবর্ষে সোনা বহিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে এভাবে বেশিদিন চলিলে সমস্ত রোমক সাম্রাজ্য স্বর্ণহীন, রক্তহীন হইয়া পড়িবে।'—কোন্ লেখকের লেখা কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত? এই বক্তব্যটি কে করেছিলেন? এর তাৎপর্য কি?

২. 'বস্তুতঃ, পশ্চিম ভারতের এই স্বর্ণদ্বারের অধিকার লইয়াই তো শক-সাতবাহন সংগ্রাম, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পশ্চিম ভারত অভিযান, স্কন্দগুপ্তের বিনিদ্র রজনী যাপন।'—কোন্ লেখকের লেখা কোন্ প্রবন্ধের অন্তর্গত? অংশটির তাৎপর্য বিশদভাবে বুঝিয়ে দাও।

৩. 'এই যুগে নগর-সভ্যতার বিস্তার ও সমৃদ্ধ নাগরিক আদর্শের যে পরিচয় বাৎস্যায়নের কামসূত্রে দেখিতেছি তাহা প্রত্যক্ষভাবে এই সামাজিক ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত।'- কোন্ লেখকের কোন রচনার অন্তর্গত? বাৎস্যায়ন কে? লেখক কোন্ যুগের কোন্ নগর-সভ্যতার কথা বলেছেন? সেই নগর-সভ্যতার উন্নতির প্রধান কারণ কি ছিল?

● **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী**

১. 'এইসব বন্দর...আশ্রয় করিয়া জাহাজে রোমক সোনার স্রোত বহিয়া আসিত ভারতবর্ষের সর্বত্র'—কোন্ কোন্ বন্দর আশ্রয় করে? কেন রোমক সোনার স্রোত ভারতবর্ষে বহে আসত?

২. 'সাধারণ গৃহস্থের ভাণ্ডারেও স্বর্ণমুদ্রা এই যুগেরই সামাজিক লক্ষণ।'—কোন যুগের কথা বলা হয়েছে? সাধারণ গৃহস্থের ভাণ্ডারেও স্বর্ণমুদ্রা আসত কিভাবে?

৩. 'বাংলাদেশের সর্বত্র এই যুগে দেখিতেছি, শাসনাধিকরণগুলিতে রাজাপাদোপজীবী ছাড়া আর যে তিনজন থাকিতেন'—আর তিনজনকে কি বলা হত? তাঁদের উপর কিসের দায়িত্ব থাকত?

৪. টীকা লিখ: গঙ্গাবন্দর, তাম্রলিপ্ত, নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক দীনার,।

● **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর: আনুমানিক, ধনোৎপাদন, গাঙ্গেয়, যৌথ, উত্তরোত্তর, আক্ষরিক অর্থ, ক্রমবর্ধমান, সামুদ্রিক বাণিজ্য, ধনাগম, স্বর্ণদ্বার, বাণিজ্যোপনিবেশ, বিনিদ্র, মনন, কলা, বহুলাংশে, গভীর চেতনা

সঞ্চারের মূলে. সাংস্কৃতিক জীবন, সমুদ্রোপকূল, প্রান্তাতিপ্রান্ত, সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, অভিযান, বিপর্যস্ত, গন্ধশিল্প, বাণিজ্যলব্ধ, ধাতবমূল্য, শিল্পমূল্য, অংশীদার, আমদানী-রপ্তানী, মুদ্রাযান, ধনোৎপাদন, কেন্দ্রীভূত, প্রচলন।

২. পদ পরিবর্তন কর: আনুমানিক, কৃষি, পরিণতি, আক্ষরিক, বৈদেশিক, সামুদ্রিক, বাণিজ্য, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সঞ্চারিত, অতিক্রম, বিস্তৃত, প্রত্যক্ষ, বিপর্যস্ত, প্রচলন, নাগরিক, সমৃদ্ধ, প্রতিষ্ঠিত, বিপর্যস্ত, ঘনিষ্ঠ, কৃষিনির্ভরতা, উৎপাদিত. সাংস্কৃতিক।

৩. বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: আরম্ভ, প্রত্যক্ষ, উন্নতি, প্রত্যন্ত, উত্তীর্ণ, প্রসার, ব্যক্তিগত, ক্রমবর্ধমান, উন্মুক্ত, সুস্পষ্ট, কেন্দ্রীভূত।

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ কর: খ্রীষ্টোত্তর. ধনোৎপাদন, উত্তরোত্তর, ধনাগম, সমুদ্রোপকূল, দুর্ভাবনা, প্রান্তাতিপ্রান্ত, নিকষোত্তীর্ণ, রাজাপাদোপজীবী।

৫. প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর: আনুমানিক, আক্ষরিক, বিবর্তন, পরিবর্তন. ক্রমবর্ধমান, সামুদ্রিক, উন্মুক্ত, লাভবান, বৈদেশিক, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, প্রচলন, আকৃতি, প্রকৃতি, নাগরিক, অংশীদার, সমৃদ্ধি।

৬ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: স্বর্ণদ্বার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমুদ্রোপকূল, উপনিবেশ. বাণিজ্যলব্ধ, কৃষিজাত, কেনাবেচা ধনোৎপাদন, জলপথ, প্রত্যক্ষ, স্বর্ণপ্রবাহ, নিকষোত্তীর্ণ, গৃহস্থ, রৌপ্যমুদ্রা, কৃষকসমাজ।

৭. শূন্যস্থান পূরণ কর: এই বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যলব্ধ — ই গুপ্ত আমলের স্বর্ণ-যুগের ভিত্তি। সাধারণ গৃহস্থের — ও স্বর্ণমুদ্রা এই যুগেরই সামাজিক লক্ষণ। এই সুবর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার নাম যথাক্রমে — ও —।

বাবা, মা ও ছেলে
বনফুল

লেখক ঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯—১৯৭৯) বনফুল ছদ্মনামেই বাংলা সাহিত্যে অধিকতর সুপরিচিত। বৃত্তি ডাক্তারি হলেও বনফুল কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় সাহিত্যসেবায় অভিনিবিষ্ট থেকেছেন। জীবনের প্রথমার্ধ কেটেছে ভাগলপুরে, পরে স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস করেছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। প্রচুর কবিতা লিখেছেন, অল্পবিস্তর প্রবন্ধও লিখেছেন। তবে তাঁর প্রতিভার চরম স্ফূর্তি প্রধানত ছোটগল্পে এবং উপন্যাসে। তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাস বিষয়-বৈচিত্র্যে, উপস্থাপনারীতিতে সর্বদাই অভিনব। ছোটগল্প রচনায় তিনি অধিকতর সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি অনেকগুলি নাটকও লিখেছিলেন। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প এবং নাটক-গ্রন্থের মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, দ্বৈরথ, কিছুক্ষণ, সপ্তর্ষি, বিদ্যাসাগর, শ্রীমধুসূদন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। []

তাঁর লেখা ঃ প্রধানত উপন্যাস ও ছোটগল্পের লেখক হিসাবে বিষয়-বৈচিত্র্য ও নব নব আঙ্গিক-প্রকরণের জন্য বনফুল বাংলা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। ব্যক্তি, সমাজ, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সূক্ষ্ম সরস ও ব্যঙ্গাত্মক বিশ্লেষণে তিনি আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের আদর্শ সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। নাট্যরচনায় বিশেষ অভিনিবেশ না থাকলেও জীবনচরিতমূলক দুখানি নাটক বিদ্যাসাগর ও শ্রীমধুসূদনে বনফুল অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বিশেষত 'শ্রীমধুসূদন' তাঁর স্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি। মহাকবি মধুসূদনের নাটকীয় উত্থান-পতনময় জীবনের ভাষ্য রচনায় বনফুল যথার্থই উচ্চশ্রেণীর শিল্পস্রষ্টার স্বাক্ষর রেখেছেন। আলোচ্য নাট্যাংশটি 'শ্রীমধুসূদন' থেকে সংকলিত। এই অংশটিতে মধুসূদনের খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণের পর তাঁর পিতা-মাতার অবস্থা কি করুণ হয়েছিল তা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। []

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর। দত্ত মহাশয় চেয়ারে উপবিষ্ট—জাহ্নবী তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছেন

রাজনারায়ণ। ওঠ—আমার পা ছাড়। তোমার কথা ত রেখেছি—লেঠেল শড়কিওলা সব ফিরিয়ে দিয়েছি—মধুকে ফিরিয়ে আনবার

প্রাণপণ চেষ্টা করেছি—হল না ত কিছুই। এ কোলকাতা শহরে খৃষ্টান না হয়ে সে যদি বিলেত গিয়ে খৃষ্টান হত তাহলেও বাঁচতাম—মাথাটা আমার এতখানি হেঁট হত না—শহরময় এমন টি টি পড়ত না। দ্বারিকঠাকুর, রামমোহন রায়—শহরের দুজন ভদ্রলোক ত বিলেত গেছেন, ওতে লজ্জার কিছু ছিল না। ছাড় আমার পা ছাড়—ওঠ—ওঠ—কি করতে বল আমাকে তুমি।

জাহ্নবী উঠিয়া বসিলেন—কিন্তু নতমুখে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

হাজারখানেক টাকাও তাকে পাঠিয়েছিলাম—যে খৃষ্টান হতে হয় বিলেত গিয়ে হও গে—কিন্তু সে টাকাও ত সে ফিরিয়ে দিয়েছে। কেঁদে আর কি হবে—আমি আর কি করব বল! একমাত্র ছেলে হলেও খৃষ্টান ছেলে আর ঘরে নেওয়া যায় না। কি মুস্কিল—কথা বলছ না কেন—কি করতে বল আমাকে তুমি।

জাহ্নবী। (ধীরে ধীরে অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিলেন) তাকে মাপ কর তুমি।

রাজনারায়ণ। মাপ করতে পারি কিন্তু ঘরে নিতে পারি না। মাপই বা করব কেন তাকে? সে আমাদের যত বড় আঘাত দিয়েছে তার ফল তাকে ভোগ করতে হবে না? পুত্রের কর্তব্য সে ত করে নি।

জাহ্নবী। রাগ কোরো না—ভেবে দেখ আমাদের কর্তব্যও আমরা করি নি।

রাজনারায়ণ। করি নি? তার জন্যে না করেছি কি? সে যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছি—তার জন্যে জলের মত অর্থব্যয় করেছি—

জাহ্নবী। টাকা খরচ করলেই কর্তব্য করা হয় না—অতিরিক্ত আদর দিয়ে আমরাই তাকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছি—মধু যে আজ এমন হয়েছে—তার জন্যে আমরাই দায়ী—

রাজনারায়ণ। তবে কি তোমার ইচ্ছেটা আমি এখন গিয়ে পায়ে ধরে তার ক্ষমা চাই?

জাহ্নবী। না, তার ক্ষমা চাইতে হবে না—তাকেই তুমি ক্ষমা

করো—তার ওপর রাগ করে থেক না। সে আমাদের একমাত্র ছেলে।

রাজনারায়ণ। (উচ্চতরকণ্ঠে) শুধু একমাত্র ছেলে নয়—একমাত্র বংশধর—জল-পিণ্ডের একমাত্র আশা। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে। ছেলে খৃষ্টান হয়েছে—ধর্মত তার মৃত্যু হয়েছে—আমরা অপুত্রক হয়েছি—তার জন্যে কাঁদতে পার—কিন্তু আর তাকে ফিরে পাবে না।

জাহ্নবী। (ব্যাকুলভাবে) না, এমন কথা তুমি ব'লো না। মধু আবার ফিরে আসবে—নিশ্চয় ফিরে আসবে—প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার তাকে ঘরে তুলে নেব আমরা। আমি প্যারীকে পাঠিয়েছি—

রাজনারায়ণ। কোথা পাঠিয়েছ?

জাহ্নবী। (সভয়ে) মধুকে ডেকে আনতে।

রাজনারায়ণ। তার মুখদর্শন করতে চাই না আমি।

উঠিয়া দাঁড়াইলেন

জাহ্নবী। রাগ ক'রো না—মাপ কর তাকে।

রাজনারায়ণ। (প্রায় চীৎকার করিয়া) মাপ তাকে আমি করতে পারি না! খৃষ্টান হয়ে সে আমার ইহকালের মর্যাদা নষ্ট করেছে—পরকালের সদ্‌গতির পথ বন্ধ করেছে। সে আমার পুত্র নয়—শত্রু!

জাহ্নবী। তার ওপর রাগ করে থেকো না—তার পড়ার খরচ বন্ধ ক'রো না।

রাজনারায়ণ। বেশ। তার জন্যে কিছু অর্থব্যয় করলেই যদি তোমার তৃপ্তি হয়—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু হিন্দু কলেজে খৃষ্টান ছেলেদের ত স্থান নেই। বিশপ্‌স্‌ কলেজে অবশ্য পড়তে পারে। খৃষ্টান ছেলেরা সেখানে পড়ে শুনেছি। (একটু পরে) কিন্তু সে আমার টাকা নেবে ত? হাজার টাকা পাঠিয়েছিলাম—ফেরত দিয়েছে। সাবালক পুত্র তোমার!

জাহ্নবী। সে আমি ব্যবস্থা করব।

রাজনারায়ণ। বেশ!

জাহ্নবী। পণ্ডিতদের বিধান নিয়েছি—তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার হিন্দু করে নেব।

রাজনারায়ণ। পণ্ডিতদের বিধানে খৃষ্টান হয়ত হিন্দু হতে পারে—কিন্তু অবাধ্য ছেলে বাধ্য হয় না। অবাধ্য ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারব না আমি ; সে অনুরোধ আমায় ক'রো না—

উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। জাহ্নবী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্যারীচরণকে দেখিয়াই জাহ্নবী ব্যস্তসমস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন

প্যারীচরণ। (চুপি চুপি) কাকীমা—মধু এসেছে।

জাহ্নবী। (সাগ্রহে) কই, কোথা ?

প্যারীচরণ। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—ভেতরে এলো না—বলছে ভেতরে এলে যদি তোমরা রাগ কর—

জাহ্নবী। যা তুই—ডেকে নিয়ে আয় তাকে—

প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন। একটু পরেই মধু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মধুর সাহেবী পোষাক। মধু আসিয়া জাহ্নবীকে জড়াইয়া ধরিলেন

মধু—মধু—বাবা আমার।

মধু। মা, খুব রাগ করেছ তুমি ? সত্যি আমায় ভুল বুঝো না মা তোমরা। আমি কোন খারাপ কাজ করি নি। খৃষ্টান হওয়া কিছু অন্যায় কাজ নয়—আগে শোন আমার কথা—মিছে ভুল বুঝে দুঃখ করো না।

জাহ্নবী। দুঃখ করব না ? তুই বলছিস কি মধু ! এ দুঃখ যে আমার ম'লেও যাবে না। আমাদের একমাত্র ছেলে তুই খৃষ্টান হয়ে গেলি—দুঃখ করব না ? না হয় বিয়ে তুই না-ই করতিস, খৃষ্টান হতে গেলি কেন !

মধু। খৃষ্টান হওয়া ত কোন খারাপ কাজ নয় মা। আজকাল পৃথিবীর সভ্য লোকেরা সবাই খৃষ্টান। আমি পৃথিবীতে বড় হতে চাই মা—খৃষ্টান না হলে বড় হওয়া যায় না। যীশুখৃষ্ট কত বড় লোক ছিলেন তা যদি জানতে তাহলে বুঝতে আমি কোন হীন কাজ করি নি। যিনি পরের জন্যে অনায়াসে—

জাহ্নবী। আমি বুঝতে চাই না বাবা! আমার একমাত্র ছেলে তুই—তোকে আমি একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারব না। তুইই কি পারবি আমায় ছেড়ে থাকতে? আমি সামনে বসে না খাওয়ালে যে তোর খাওয়া হয় না বাবা! এ ক'দিন কোথা ছিলি তুই? কোথায় খাওয়া দাওয়া করেছিলি—

অশ্রুপাত

মধু। চ্যাপলেন ভনের বাড়ীতে আছি এখন। কাঁদছ কেন তুমি?

জাহ্নবী। আজই চলে আয় তুই সেখান থেকে—আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

মধু। এখন নয় মা—ওরা আমাকে বিলেত নিয়ে যাবে বলেছে—ওদের সঙ্গে এখন কিছুদিন থাকা দরকার—

জাহ্নবী। না, কিছু দরকার নেই। এখানকার লেখাপড়া শেষ করে নে—বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা পরে হবে'খন।

মধু। বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়ার অনেক খরচ—পাব কোথায়?

জাহ্নবী। পাবি কোথায়! এতদিন যেখানে পেয়েছিস সেখানেই পাবি।

মধু। বাবার টাকা আমি নেব না।

জাহ্নবী। অমন কথা বলিস যদি আত্মহত্যা করব আমি! (সস্নেহে) ছি বাবা, অমন কথা বলতে নেই। পণ্ডিতদের বিধান নিয়েছি—শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার তোকে—

মধু। প্রায়শ্চিত্ত? কিসের? কোন পাপ ত করি নি!

জাহ্নবী। তা না হলে সমাজে যে তোকে ঠাঁই দেবে না।

মধু। এই পচা সমাজে ঠাঁই পেতে আমার মোটেই আগ্রহ নেই। তা'ছাড়া আমি বিলেত যাবই—তখন এ সমাজে আমার স্থান হবে কি করে? এ সমাজে ত বিলেত-ফেরতদেরও স্থান নেই।

জাহ্নবী। প্রায়শ্চিত্ত করবি না তুই তাহলে?

মধু। অসম্ভব—প্রায়শ্চিত্ত করব কেন? কি এমন পাপ করেছি!

জাহ্নবী। লক্ষ্মী বাবা আমার—

মধু। তোমার কথায় বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়াশোনা করতে রাজি আছি—কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব না।

জাহ্নবী নতমুখে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন

কেঁদো না মা, কাঁদছ কেন শুধু শুধু। কেঁদো না—কেঁদো না—তোমার কান্না দেখতে পারি না আমি। বিশ্বাস কর আমি কোন খারাপ কাজ করি নি। আমি বড় হতে চাই—আজকাল খৃষ্টান না হলে বড় কিছু হওয়া যায় না। অবুঝের মত কেঁদো না খালি—বুঝে দেখ—শোন আমার কথা—মা শুনছ—কেঁদো না—কেঁদো না—

জাহ্নবী। তুই ফিরে আয় বাবা—

মধু। আমি ত যাইনি কোথাও—শুধু শুধু অস্থির হও কেন?

জাহ্নবী। ফিরে আয় বাবা—তুই ফিরে আয়—

উঠিয়া গিয়া মধুকে জড়াইয়া ধরিলেন—অবিচলিত মধু কিছুক্ষণ শুব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা বলিলেন—

মধু। আমি এখন চললাম—

জাহ্নবী। এখনই? হ্যাঁ—প্রায়শ্চিত্তের তাহলে—

মধু। ও কথা ব'লো না—তাহলে আর আসব না আমি। প্রায়শ্চিত্ত করা অসম্ভব! সে আমি পারব না।

দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। জাহ্নবী তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

[সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'তাকে মাপ করো তুমি'।—কে, কাকে একথা বলেছেন? 'তাকে' কাকে? 'তাকে' মাপ করার জন্য বলা হয়েছে কেন?

২. 'তার মুখদর্শন করতে চাই না আমি।'—কে, কাকে বলেছেন? 'তার'

—কার? বক্তা 'তার' মুখদর্শন করতে চান না কেন? বক্তার চরিত্রের কি পরিচয় এই নাট্যাংশে ফুটে উঠেছে?

৩. 'আমি বুঝতে চাই না বাবা।'—একথা কে বলেছেন? কাকে বলেছেন? তিনি কি বুঝতে চান না?

৪. 'ফিরে আয় বাবা'—কে, কাকে ফিরে আসতে আহ্বান জানাচ্ছেন? তাকে কোথায় ফিরে আসার জন্য এই আহ্বান? বক্তার চরিত্রের কি পরিচয় ফুটে উঠেছে এই নাট্যাংশে?

৫. 'প্রায়শ্চিত্ত করা অসম্ভব। সে আমি পারব না।'—কার উক্তি? কার প্রতি? 'প্রায়শ্চিত্ত' কি? বক্তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলা হয়েছে কেন? এই নাট্যাংশে বক্তার চরিত্রের কি পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে?

৬ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও: দ্বারিক ঠাকুর, রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ, জাহ্নবী।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১. 'সে আমাকে যত বড় আঘাত দিয়েছে তার ফল তাকে ভোগ করতে হবে না? পুত্রের কর্তব্য সে ত করে নি।'—কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অংশ এটি? বক্তা কার সম্পর্কে, কেন এইরকম অভিযোগ করেছেন?

২. 'পণ্ডিতদের বিধানে খৃষ্টান হয়ত হিন্দু হতে পারে—কিন্তু অবাধ্য ছেলে বাধ্য হয় না।'—কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অংশ এটি? কে, কার সম্পর্কে এবং কেন এরকম মন্তব্য করেছেন?

৩. 'এই পচা সমাজে ঠাঁই পেতে আমার মোটেই আগ্রহ নেই।'—কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অংশ এটি? বক্তা 'পচা সমাজ' বলতে কি বুঝিয়েছেন? এখানে তিনি ঠাঁই পেতে চান না কেন? তাঁর লক্ষ্য কি?

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'ছেলে খৃষ্টান হয়েছে—ধর্মত তার মৃত্যু হয়েছে—আমরা অপুত্রক হয়েছি।'—'ছেলে' কে? তিনি খৃষ্টান হয়েছেন কেন? বক্তা 'অপুত্রক' হয়েছেন বলছেন কেন?

২. 'সে আমার পুত্র নয়—শত্রু'।—কে, কাকে একথা বলেছেন? কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? তিনি 'পুত্র নয়—শত্রু' কেন?

৩. 'টাকা খরচ করলেই কর্তব্য করা হয় না—অতিরিক্ত আদর দিয়ে আমরাই তাকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছি—মধু যে আজ এমন হয়েছে—তার জন্যে আমরাই দায়ী—' কে, কাকে একথা বলেছেন ? মধু কে ? তাঁর উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার জন্য তাঁরা দায়ী কেন ?

৪. 'প্রায়শ্চিত্ত ! কিসের ? কোন পাপ ত করিনি !'—বক্তা কে ? তাঁর কোন্ কাজকে পাপ বলে মনে করা হয়েছে ? তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে চান না কেন ?

৫. 'অবুঝের মত কেঁদো না খালি—বুঝে দেখ—শোন আমার কথা—মা শুনছ—কেঁদো না—কেঁদো না'—বক্তা কে ? তিনি মাকে 'অবুঝ' বলেছেন কেন ? মায়ের কান্নার হেতু কি ? এই উক্তি থেকে বক্তার চরিত্রের কি পরিচয় ফুটে উঠেছে ?

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর : টি টি পড়া, অশ্রু বিসর্জন, অশ্রুপ্লাবিত, উচ্ছৃঙ্খল, অপুত্রক, প্রায়শ্চিত্ত, সদ্গতি, মুখদর্শন, ইহকাল, পরকাল, আপত্তি, বিধান।

২. সন্ধি বিচ্ছেদ কর : উচ্ছৃঙ্খল, প্রায়শ্চিত্ত, সদ্গতি।

৩. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : অশ্রুপ্লাবিত, বংশধর, মুখদর্শন, ইহকাল, পরকাল, সদ্গতি, অর্থব্যয়, অনায়াস, বিলেত-ফেরত, অবুঝ, অশ্রুবিসর্জন।

৪. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর : শড়কিওয়ালা, শহরময় দায়ী, বিধান, কর্তব্য।

৫. পদ পরিবর্তন কর : খৃষ্টান, অতিরিক্ত, উচ্ছৃঙ্খল, মৃত্যু, নিশ্চয়, ইহ, শত্রু, সাবালক, সভ্য, বিধান, পাপ।

৬. শূন্যস্থান পূর্ণ কর : শহরময় এমন — — পড়ত না। পুত্রের —সে ত করেনি। অতিরিক্ত আদর দিয়ে আমরাই তাকে — করে তুলেছি। ধর্মত তার — হয়েছে। সে আমার পুত্র নয় —। তাকে — করিয়ে আবার হিন্দু করে নেব।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়

আশিস্ নাহা

লেখক : আশিস্ নাহা তরুণ লেখক ও কবি। কোচবিহারে জন্ম। স্বদেশের ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে আশিস্ কয়েকটি তথ্যনিষ্ঠ ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। []
তাঁর লেখা : সহজ সাদামাটা ভাষায়, সরাসরি বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে সকলের পাঠোপযোগী করে প্রকাশ করার ক্ষমতা আশিসের লেখার একটা বড়ো গুণ। এই নিবন্ধে লেখক সিপাহী বিদ্রোহ থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অর্থাৎ ১৮৫৭ থেকে ১৯০৭—পঞ্চাশ বছরের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। বস্তুত, আমাদের স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের পেছনে যে দীর্ঘ ও অনবচ্ছিন্ন সংগ্রামী ইতিহাস বর্তমান, তা না জানলে স্বাধীনতা আন্দোলনের-ইতিহাস পাঠ অসম্পূর্ণই থেকে যায়। []

“ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।”

বাঙালী কবির এই উক্তির মধ্যে যেমন যুগপৎ আক্ষেপ ও আশা রহিয়াছে, তেমনি নিহিত রহিয়াছে এক চরম ঐতিহাসিক সত্য। বাঙালীর ভুলেই একদিন গঙ্গাতীরে পলাশীর আম্রকাননে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হইয়াছিল। বস্তুত ইংরেজের ভারত জয় কখনই গৌরবের ইতিহাস নহে। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ইত্যাদির গোপন সহায়তায় নিশাচর শ্বাপদের মতো অনৈক্যের চোরাবালি, বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধকার পথ ধরিয়াই একদিন ইংরেজ ভারতে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল।

ইতিহাসের পাতা খুঁজিলে দেখা যাইবে, বিশাল ভারতবর্ষ তখন অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। সমস্ত দেশে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না বলিলেই হয়। বিভক্ত রাজ্যগুলি পরস্পর ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে লিপ্ত ছিল। জাতীয় অনৈক্যের এই সুবর্ণ-সুযোগে বাণিজ্যলিপ্সু ইংরেজ ভারতের মাটিতে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করে। অবশ্য ইহার পরও মীরকাশিম ইংরেজ প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া কিছুকাল স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে পলাশীর যুদ্ধের পর হইতেই ইংরেজরা ভারতীয় রাজনীতির অদৃশ্য নিয়ামক হইয়া দাঁড়ায়।

এইখানেই শেষ নয়। কালের অমোঘ গতিতে ইতিহাসের রথচক্র কখনও ধীর গতিতে কখনও বা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল হিসাবেই ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতে প্রবেশ করিল। ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সঞ্জীবনী স্পর্শে এদেশের মানুষের মোহমুক্তি ঘটে। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারে রাজা রামমোহনের ভূমিকা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য। ক্রমশ ব্রিটিশ শাসনের নগ্ন রূপ উপলব্ধি করায় স্বাধীনতার জন্য এক আকুল আর্তি দেখা দেয়। দেশের সর্বত্র বিক্ষোভের ইতস্তত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইহাদের মধ্যে সন্ন্যাস-বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ, চোয়াড়-বিদ্রোহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত বিদ্রোহীদের মধ্যে অচল সিংহ, তীতুমীর, সুন্দরা-মাঝি ইত্যাদির নাম জাতি বিস্মৃত হইলেও ইতিহাস ইহাদের ভুলে নাই। দেশীয় রাজন্যবর্গও ভারতের মাটি হইতে ব্রিটিশ-শাসন উচ্ছেদের নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মহীশূরের হায়দার আলি ও তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান, পাঞ্জাবের অন্তর্গত মূলতানের শাসনকর্তা, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, অযোধ্যার নবাব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বীর টিপু সুলতান ইংরেজশক্তিকে প্রতিহত করিতে গিয়া শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দেন। পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর

পর শিখশক্তিও বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। চিলিয়ান-ওয়ালার যুদ্ধে জেনারেল গাফের হস্তে শিখবাহিনীর পরাজয়ের পরই ভারতে ব্রিটিশ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসম্পূর্ণ হয়। অবশ্য ইহার পরে ইতস্তত দু-একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু এই সমস্ত বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকায় এইগুলি তেমন সাফল্য লাভ করে নাই।

কিন্তু এই সমস্ত খণ্ড-বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহে। বাংলাদেশের ব্যারাকপুর সেনানিবাসে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহীকে ফাঁসির আদেশ দেওয়াতেই সর্বপ্রথম বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। অতঃপর বাংলা, বিহার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্রোহের বহ্নি ছড়াইয়া পড়ে। এই সমস্ত অঞ্চলের সিপাহীগণের একযোগে বিদ্রোহের ফলে ভারতবর্ষের বহু অঞ্চল কিছুকালের জন্য ইংরেজের শাসন-মুক্ত হইয়াছিল।

সিপাহী-বিদ্রোহ কোন একটিমাত্র কারণের ফল নয়। ব্রিটিশ সরকার ঘোষিত দেশীয় রাজাদের উপর প্রযোজ্য স্বত্ব-বিলোপ-নীতির প্রতিবাদে, এনফিল্ড রাইফেলের টোটায় গোরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে ভয়ে ধর্মপ্রাণ সৈনিকগণের ধর্মনাশের আশঙ্কা, ধ্বংসোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের পুনপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ইত্যাদি কারণের এক সমষ্টিগত ফল হিসাবেই প্রথমে সিপাহী-বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। যে উদ্দেশ্যেই শুরু হউক না কেন, পরে অনেক স্থানেই উহা জাতীয় আন্দোলনের রূপ লাভ করে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বিদ্রোহীরা মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে তাহাদের অধিনায়ক নির্বাচিত করে। অপরাপর নেতাদের মধ্যে তৎকালীন পেশোয়ার দত্তকপুত্র নানাসাহেব, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপি, কুনওয়ার সিং প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহও উপযুক্ত সমরকুশলতা, সুদৃঢ়

একক নেতৃত্ব, উদ্দেশ্যের একতা ইত্যাদির অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ আপন রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রণক্ষেত্রেই প্রাণ দেন। নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপিও যথোচিত বীরত্বের সহিত লড়াই করেন। পরাজিত সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে ইংরেজরা সুদূর ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত করে।

সিপাহী-বিদ্রোহের পরই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বদলে ভারতবর্ষ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণার মাধ্যমে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঘোষণা Magna Carta of India নামে পরিচিত। পরবর্তী কয়েক বৎসর ভারতে সকল প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করা হইল। সিপাহী-বিদ্রোহের পরবর্তী আন্দোলনগুলির মধ্যে 'নীল বিদ্রোহ' উল্লেখযোগ্য। নীল-বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ শাসনের মর্মমূলে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলশ্রুতিতে নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচার চিরতরে বন্ধ হইয়াছিল। নীলচাষীদের দুর্দশার কথা যাঁহারা সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরেন তাঁহাদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত 'নীলদর্পণ' 'Uncle Tom's Cabin'-এর মতোই ভারতীয় নীলচাষীদের জীবনবেদ হইয়া দাঁড়ায়। 'হিন্দুস্থান পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার পত্রিকায় জ্বালাময়ী লেখনীর মাধ্যমে নীলচাষীদের কথা সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরেন। এইরূপ শোনা যায় যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'Indigo Planters' Mirror' শীর্ষনামে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণের' ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং পাদ্রী লং সাহেবকে উহার ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ার অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল।

শুধুমাত্র আন্দোলনই নয়, সংবাদপত্রগুলিও সরকারী দমন-নীতি হইতে অব্যাহতি পাইল না। দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে দমনের নিমিত্ত লর্ড লিটন Vernacular Press Act প্রণয়ন করেন। এই আইন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য জাতীয়বাদী অমৃতবাজার পত্রিকা রাতারাতি

ইংরেজী পত্রিকায় রূপান্তরিত হইল। ইহার পরবর্তী স্তরে লর্ড রিপনের উদারনৈতিক শাসনের ফলে এবং ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ সমাজের আন্দোলনের বিরুদ্ধে, ভারতীয়দের প্রতি আন্দোলন ইত্যাদির ফলে ভারতের সর্বত্র এক গভীর জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠে। এই সময় ভারতীয়দের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠনগুলির মধ্যে 'Britsh Indian Association'-এর নাম উল্লেখ্য। অবশ্য এই সংগঠন দেশের আপামর সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিত বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। তাই প্রয়োজন ছিল ভারতীয়দের সার্বিক প্রতিনিধিত্বকারী কোন সংগঠনের। এই প্রয়োজনীয়তা ও এ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম নামক এক ইংরেজের খোলা চিঠির ভিত্তিতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট শহরে সম্মেলনের পর জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দলের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতি এক নূতন রূপ গ্রহণ করে। অবশ্য প্রথমে ভারতীয়দের জন্য সামান্য রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের প্রয়োজনে ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যেই জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হন।

কিন্তু ধীরে ধীরে এই দল সংগ্রামী রূপ লাভ করে। এই সময় বা কিছু পরবর্তী সময় হইতেই জাতীয় আন্দোলনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ তথা বাঙালী জাতিকে অগ্রণী হইতে দেখা যায়। প্রথমদিকে বাংলাদেশে স্বাদেশিকতাবোধ জাগাইয়া তুলিতে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে স্বাদেশিকতা বোধ সৃষ্টিতে 'হিন্দুমেলার' ভূমিকাও উল্লেখ্য। এই সময় ভারতের "লাল, বাল, পাল"—লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল এই ত্রয়ী নেতার মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন বাঙালী। অর্থাৎ তৎকালীন রাজনীতিতে বাংলাদেশকে পুরোধা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যাহা হউক শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ বাঙালী জাতিকে ক্রমশ ভারতীয় রাজনীতিতে

নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে দেখিয়া ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হইলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাই লর্ড কার্জন বৃহৎ বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিবার নীতি ঘোষণা করিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম লইয়া একটি প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি লইয়া অপর একটি প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইল। শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাতেই যদিও ঐরূপ করা হইয়াছিল তবুও ইহার আসল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বাঙালী-জাতির অগ্রণী-ভূমিকাকে খর্ব করা। ব্রিটিশ সরকারের এই অভিসন্ধির বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলাদেশ তথা ভারতে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন গড়িয়া উঠে। ইতিহাসে ইহা 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মুখে সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট লর্ড কার্জন দর্পভরে বলিয়াছিলেন, 'The partition of Bengal is a settled fact.' প্রত্যুত্তরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'I shall unsettle the settled fact.' ব্রিটিশ সরকার পশুশক্তির সাহায্যে এই আন্দোলন দমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সরকারী দমন-নীতির প্রতিবাদে দেশে বিলাতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিলাতি পণ্য ইত্যাদি বর্জনের প্রবল উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেল। অনেক স্থানে বিকল্প হিসাবে দেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠে। কলিকাতায় 'গৌড়ীয় বিদ্যায়তন' নামে একটি জাতীয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমর্থনে আগাইয়া আসিলেন। তাঁহার রচিত "বাংলার মাটি, বাংলার জল / বাংলার বায়ু, বাংলার ফল/পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান" এই গান সমস্ত বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রী একই সুত্রে ও সুরে বাঁধিয়া দিল। বিপিনচন্দ্র পাল, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দুর্দমনীয় হইয়া উঠে। অবশেষে আন্দোলনের প্রচণ্ডতার মুখে পড়িয়া ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে বাধ্য হইলেন। যদিও বঙ্গভঙ্গ রদ করা হইল তবুও বাংলাদেশ পুরোপুরি ১৯০৫ সালের পূর্বের মানচিত্রে ফিরিয়া গেল না। বাংলাদেশ হইতে বিহার ও উড়িষ্যাকে পৃথক

করিয়া স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হইল। তাহা ছাড়া রাজনৈতিক-ভাবে বাংলাদেশকে পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে স্থায়ীভাবে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইল। তবুও বিচারপূর্বক এইরূপ বলা চলে যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গুরুত্ব তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিতে ছিল অসীম। এই আন্দোলনের ফলে বাঙালীর জাতীয় ঐক্য যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তেমনি ব্রিটিশ সরকারের দমন-নীতির ব্যর্থতাও পরিস্ফুট হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করিয়াছিল। ইহার পরবর্তী ইতিহাস বহু শহীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস। এই দীর্ঘ ধারাবাহিক সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, জহরলাল নেহরু প্রমুখ চিরবরণীয় দেশনেতার নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রাম-শেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে।

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই সময়কালের বিভিন্ন আন্দোলন ও সেইসব আন্দোলনের নেতাদের পরিচয় দাও।

২. ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রসিদ্ধ কেন? এই আন্দোলনের পরিচয় দাও এবং ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার অভিমত বল।

৩. টীকা লেখ: পলাশীর যুদ্ধ, মীরজাফর, উমিচাঁদ, মীরকাশিম, হায়দার আলি, টিপু সুলতান, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, সিপাহীবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, British Indian Association, জাতীয় কংগ্রেস, লাল-বাল-পাল, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, লর্ড কার্জন।

● **ব্যখ্যামূলক প্রশ্নাবলী**

১. 'তবুও একথা অনস্বীকার্য যে পলাশীর যুদ্ধের পর হইতেই ইংরেজরা ভারতীয় রাজনীতির অদৃশ্য নিয়ামক হইয়া দাঁড়ায়।'—কোন্ লেখক রচিত কোন্ রচনা হতে অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে? অংশটি বিশ্লেষণ করলে কি সহজ অর্থ পাওয়া যায়?

২. "তাঁহার রচিত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল/বাংলার বায়ু, বাংলার ফল/ পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান' এই গান সমস্ত বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রী একই সূত্রে ও সুরে বাঁধিয়া দিল।"—কোন্ লেখকের লেখা কোন্ রচনার অন্তর্গত এই অংশটি? অংশটির সরল অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

● **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী**

১. 'দেশের সর্বত্র বিক্ষোভের ইতস্তত বহিঃপ্রকাশ ঘটে।'—এই বিক্ষোভের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। এই বিক্ষোভের কয়েকজন নেতার নাম উল্লেখ কর।

২. 'কিন্তু এই সমস্ত খণ্ড-বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে।'—সিপাহী বিদ্রোহ কি? ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ইহার ফলাফল বর্ণনা কর।

৩. 'পরবর্তী আন্দোলনগুলির মধ্যে নীল বিদ্রোহ' উল্লেখযোগ্য'—নীলবিদ্রোহের কারণ কি? এই বিদ্রোহের ফল কি হয়েছিল?

৪. 'তাঁহার রচিত নীলদর্পণ 'Uncle Tom's Cabin-এর মতোই ভারতীয় নীলচাষীদের জীবনবেদ হইয়া দাঁড়ায়।'—নীলদর্পণ কার লেখা? Uncle Tom's Cabin কে লেখেন? ঐ গ্রন্থের বিষয়বস্তু কি? নীলদর্পণকে নীলচাষীদের জীবনবেদ বলা হয়েছে কেন?

৫. নীলবিদ্রোহ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন ও পাদ্রী লঙ সাহেবের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় কেন?

৬. Vernacular Press Act কি? ইলবার্ট বিল কি? British Indian Association কি?

৭. জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কবে হয়? ইহার প্রথম সভাপতি কে হয়েছিলেন?

৮. 'হিন্দুমেলা' কি? স্বদেশী আন্দোলনে এই মেলার ভূমিকা কি?

৯. 'ইতিহাসে ইহা 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধ।'—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিচয় দাও। এই আন্দোলনের ফলাফল কি হয়েছিল?

● **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. শব্দার্থ লেখ ও শব্দগুলিকে বাক্যে প্রয়োগ কর: দিবাকর, যুগপৎ, নিশাচর, শ্বাপদ, চোরাবালি, ভ্রাতৃঘাতী, নিয়ামক, সঞ্জীবনী স্পর্শে, চূড়ান্ত, অধিনায়ক, কণ্ঠরোধ, মর্মমূলে, জ্বালাময়ী, লেখনী, অব্যাহতি, জাতীয়তাবোধ, নিয়মতান্ত্রিক, অভিসন্ধি, দমননীতি, উন্মাদনা, দুর্দমনীয়, উন্মোচন, ধারাবাহিক।

২. পদ পরিবর্তন কর: বিস্তার, বিভক্ত, বাণিজ্যলিপ্সু, পরিচালনা, প্রবেশ, উপলব্ধি, বিসর্জন, পরাজয়, সীমাবদ্ধ, বিদ্রোহ, আশঙ্কা, নির্বাচিত, নির্বাসিত, অন্তর্ভুক্ত, আঘাত, প্রণয়ন, রূপান্তরিত, প্রতিষ্ঠা, ঘোষিত।

৩. সন্ধিবিচ্ছেদ কর: সংঘাত, ইতস্তত, উচ্ছেদ, উল্লেখ, অভ্যুত্থান, ধ্বংসোন্মুখ, পর্যবসিত, যথোচিত, দুর্দশা, রূপান্তরিত, অত্যুক্তি, দুর্দমনীয়, দিগন্ত, উন্মোচন, স্বাধীনতা।

৪. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: স্বাধীনতাসূর্য, বাণিজ্যলিপ্সু, সেনানিবাস, সিপাহী-বিদ্রোহ, রণক্ষেত্র, কণ্ঠরোধ, জীবনবেদ, দমননীতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চিরবরণীয়, দেশনেতা।

৫ প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর: গৌরব, গতি, অভ্যুত্থান, সাফল্য, জাতীয়, লড়াই, প্রণয়ন, প্রয়োজনীয়তা, নিয়মতান্ত্রিক, সংগ্রামী, প্রসিদ্ধ, ইতিহাস।

৬ চলতি ভাষায় পরিবর্তন কর: কিন্তু ধীরে ধীরে এই দল সংগ্রামী রূপ লাভ করে। এই সময় বা কিছু পরবর্তী সময় হইতেই জাতীয় আন্দোলনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ তথা বাঙালী জাতিকে অগ্রণী হইতে দেখা যায়।

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road

অপু দুর্গার জগৎ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লেখক ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯২০) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং সুলেখক। কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ—পদাতিক, চিরকুট, কাল মধুমাস, ছেলে গেছে বনে প্রভৃতি। কবিতার মত সুভাষ গদ্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত। গদ্যগ্রন্থের মধ্যে 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' বিশেষ সুপরিচিত। []

তাঁর লেখা ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি হিসাবেই প্রসিদ্ধ; কিন্তু তিনি যে চমৎকার গদ্য লেখেন, তার নজির মাঝে-মাঝেই চোখে পড়ে। সাদাসিধে ভাষা অথচ চমৎকার বাক্‌ভঙ্গি ও বিনুনি তাঁর গদ্যের বৈশিষ্ট্য। 'অপুদুর্গার জগৎ' ভ্রমণমূলক রচনা। এটি লেখকের 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' বইটি থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। ব্যারাকপুর—এখন শ্রীপল্লী নামেই বেশি পরিচিত, সুসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃভূমি। সেই ব্যারাকপুর ভ্রমণ প্রসঙ্গে লেখক বিভূতিভূষণের'পথের পাঁচালী'র অপুদুর্গার কথা স্মরণ করেছেন। বিভূতিভূষণ নিজেই অপু। এই গ্রামেই অপুদুর্গার জন্ম হয়েছিল—লেখকের মানসভূমিতে। সেই গ্রামের অবস্থা, হালচাল, জীবিকা ইত্যাদি নিয়ে লেখক ঘরোয়া ঢঙে অনেক কথা বলেছেন। ভ্রমণমূলক রচনা হলেই যে তাতে সমুদ্র, পর্বত, মহানগর, মরুভূমি প্রভৃতির বর্ণনা থাকবে তাতো নয়। 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া' 'একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'ও তো দেখা চাই। []

এক যুগ পরে বনগাঁ থেকে আবার সেই চাকদা'র বাস।

বাসে দিব্যি বসার জায়গা পাওয়া গেল। রোগা চেহারার একটি ফর্সা ছেলে কমলালেবু ফেরি করছিল। তার সারা শরীরে অপুষ্টির ছাপ। মনে হল, রক্তহীনতা তার গায়ের রঙে যে পাণ্ডুরতা এনেছে তাতে তাকে একটু অস্বাভাবিক রকমের ফর্সা দেখাচ্ছে। তার ঠিক পিঠোপিঠি যে ছেলেটা ধূপকাঠির ঝোলা কাঁধে উঠেছিল, তার গায়ের রং কালোকোলো, হাড়গুলোও চ্যাটালো। বিক্রির ব্যাপারেও দেখা

গেল সে অনেক বেশি পটু। ওদের কথার আড়ে বোঝা গেল দুজনে বন্ধু। হয়ত দুজনেই ইস্কুলে পড়ে কিংবা পড়ত ; যখন ওদের হেসে-খেলে বেড়াবার বয়স, তখনই সংসারের ভার ওদের বইতে হচ্ছে।

এসব দেখে দেখে মনের মধ্যে কেমন যেন ঘাঁটা পড়ে গেছে। তবু একটা ভাবনা মনের মধ্যে কাঁটার মত খচখচ করে। সবাই খেয়ে পরে সুখে আছে— এমন দিন কি দেখে যেতে পারব না ?

শ্রীপল্লীর মোড়ে এসে বাস থেকে নেমে পড়লাম। আমি আর অপু। গ্রাম সফরে অপু আমার সঙ্গী।

অপু এই নামটা হঠাৎ মনে হতেই আমার স্মৃতিতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আসলে শ্রীপল্লী নয়, এ তো বারাকপুর। পথের পাঁচালির অপুর জায়গা। বিভূতিভূষণের ভিটে।

এখন ডাক বদলেছে। বারাকপুরের চেয়ে শ্রীপল্লীরই এখন নামডাক বেশি। বারাকপুরের বদলে শ্রীপল্লীর মোড় বলাটাই লোকের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। খবর পেয়ে মহানন্দ এসেছিল আমাদের নিতে। এক রিকশাতে আমরা তিনজন। ডানদিকে ইছামতী নদী।

এ অঞ্চলেও পূবের মানুষই এখন সংখ্যায় বেশি। বারাকপুরের পুরনো বাসিন্দারা অনেকেই মরে হেজে গেছে। কিংবা গ্রামের পাট উঠিয়ে প্রবাসেই ঘর বেঁধেছে।

আমরা সোজা গিয়ে উঠলাম মাস্টারমশাই ফণী চক্কোত্তির বাড়িতে। উঁচু দাওয়া, মাটির দেয়াল, খড়ের চাল। বাঁশের গায়ে ঝোলানো খেলো হুঁকো। যা আজকাল গাঁয়ের দিকেও ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। হুঁকো কল্কে তামাক টিকে—কে আর অত ভজকট করে। পকেটে বা ট্যাঁকে বিড়ি রাখো, ফস করে ধরাও, টান মেরে ফেলে দাও—ব্যস, মিটে গেল।

মহানন্দর মুখ দেখে মাস্টারমশাই ঠিক বুঝেছিলেন, ওর খাওয়া হয় নি। কোনো কথা না শুনে ওকে স্নান করে খাওয়ার জন্যে অন্দর-মহলে পাঠিয়ে দিলেন।

এত অভাব-অনটনের মধ্যেও এই স্নেহ-মমতাগুলো গ্রামদেশে তাহলে টিঁকে রয়েছে। দেখে ভাল লাগল। আধুনিকের যুক্তিতে আমার এই ভাল লাগাটা হয়ত উচিত হল না।

ফণীবাবু অবশ্য এসব যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে। উনি বরিশালের বাঙাল যে।

ওঁর একটা বড় গর্ব বিভূতিভূষণকে উনি চিনতেন। বিভূতিবাবু কোন্ ঘাটে স্নান করতেন, কোন্ গাছতলায় বসে লিখতেন সমস্তই ওঁর নখদর্পণে। এ গ্রামের মানুষজন, মাঠ, নদী, গাছপালা সমস্তই তিনি তাঁর নানা বইতে ফুটিয়ে তুলে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখে গেছেন। ফণীবাবু বললেন, তাঁর ছিল একটাই দোষ—বড় বেশি মিতব্যয়ী ছিলেন। আধ-খাওয়া বিড়িও পকেটে রেখে দিতেন। ধরে ফেললে সলজ্জভাবে হেসে বলতেন, ফেলব কেন? আরেকবার তো খাওয়া চলবে। তবে ফণীবাবুকে তাঁর নিজের বই দিতে কখনও কার্পণ্য করেন নি।

ফণীবাবু হাত বাড়িয়ে দেখান—ঐ দেখুন, সেই কুঠির মাঠ। বিভূতিবাবুর বেড়াবার প্রিয় জায়গা। কাটাখালির পুল, বেলডাঙা, নতিডাঙা, সুন্দরপুর, মোল্লাহাটি—সবই পাবেন তাঁর বইতে। তবে সমস্তই খুব বদলে গেছে।

এখনও রয়েছেন বিভূতিবাবুর বাল্যবন্ধু পতিতবাবু। বিভূতিভূষণের জীবনকথা তাঁর কাছ থেকেই বেশি জানা যাবে। কিন্তু শরীরও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেবার বারাকপুর গ্রামে গিয়েছিলাম সন্ধ্যের পর। ফলে, হাতলণ্ঠনের আলোয় কিছুই তেমন নজরে আসে নি।

এবার দিনের আলোয় দেখলাম মাটিতে মিশে-যাওয়া বিভূতিবাবুদের আদত মাটির বাড়ির ভিটে। তার সামনে পাকা দালানেরও জীর্ণদশা। সরকার নাকি গেয়ে রেখেছে স্মৃতিরক্ষার একটা ব্যবস্থা হবে।

চিরকালের সেই হচ্ছে হবে!

শুধু তো বিভূতিভূষণ নন, বনগাঁর প্রাতঃস্মরণীয়দের মধ্যে আছেন দীনবন্ধু মিত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থানীয়ভাবে তাঁদের স্মৃতি জাগিয়ে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা আজও হয় নি। এসব হতে করতে আরও কতদিন লাগবে কে জানে।

রাস্তায় যেতে যেতে ফণীবাবুকে জিগ্যেস করলাম, এটা কী ফুল?

বললেন, বনতুলসী। এই ফুল বিভূতিভূষণের খুব প্রিয় ছিল।

তারপর হাসতে হাসতে সেইসঙ্গে যোগ করলেন, আমাদের বরিশালে এর কী নাম জানেন? বরিশালে বলে 'পেত্নীবন'।

হয়ত আবছা আলোয় বনতুলসীর সাদা সাদা ফুল থান কাপড়ের মত দেখায়। সেইসঙ্গে যদি হাওয়া থাকে, তাহলে পেত্নী ভাবা অসম্ভব নয়।

জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা কোন্‌টা ঘেঁটুফুল বলুন তো?

ফণীবাবু বললেন, ঘেঁটুফুল এখানে আর পাবেন না। সেবার বানে ডোবার পর থেকে ঘেঁটুফুল ঝাড়েবংশে শেষ। এ গ্রামে এখন আর ঘেঁটুফুল নেই।

অপুদুর্গার জগৎ কত যে বদলে গেছে ভাবাই যায় না।

বন্যার ঠিক পরে পরেই সেবার আমি এসেছিলাম। শ্রীপল্লী সমবায় সমিতি লঙ্গরখানা খুলে গ্রামের লোকদের মরণদশা থেকে বাঁচিয়েছিল। আমি গিয়ে পৌঁচেছিলাম লঙ্গরখানা বন্ধ হওয়ার উৎসবের দিন।

ফণীবাবুকে বললাম, চলুন সমবায় সমিতিটা একবার দেখে আসি।

সমবায় সমিতি? সে তো কবে উঠে গেছে। কেন, শোনেন নি?

কাছাকাছি বাজ পড়লেও আমি বোধহয় এতটা চমকাতাম না। সমবায় উঠে গেল? গ্রামের লোকে বাঁচাতে পারল না?

শ্রীপল্লী সমবায় সমিতির গমগমে অফিসঘরটা এখন আমার

চোখে ভাসছে। কানে লেগে আছে ডায়নামোর ভটর ভটর আর ধানভাঙা কলের ঘর্ঘর শব্দে গোটা গ্রামের প্রাণের স্পন্দন। সমিতির ছিল ইস্কুল, মাতৃমঙ্গল, সব্‌জিক্ষেত, ইঁটখোলা, ট্র্যাকটর, বাস, কামারশালা, ছুতোরবাড়ি—আজ তার কিচ্ছু নেই?

কিচ্ছু নেই। শুধু কায়দা করে ইস্কুলের জন্যে বিঘে তিনেক জমি বাঁচানো গেছে। শুনে কী যে মন খারাপ হয়ে গেল বলার নয়। একে নেতৃত্বের কোঁদল। তার ওপর চুরি করে করে সমিতিকে ফোঁপরা করে দিয়েছিল। না উঠে উপায় আছে? সমিতিকে চুলোয় দিয়ে কিছু চাঁই ধরনের লোক নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। কপাল পুড়লো গ্রামের লোকের। এরপর সমবায়ের নাম শুনলে লোকে কানে আঙুল দেবে। ন্যাড়া আর বেলতলায় যায়?

কবরেজমশাই এখন চায়ের দোকান খুলে বসেছেন। বয়স হল একাশি। দেখে কে বলবে?

এলাম এক যুগ পরে। তবু আমাকে দেখে অনেকেই চিনতে পারল। সেই লঙ্গরখানার সময় এসেছিলেন না?

বাইরের লোক এসব অঞ্চলে খুব বেশি তো আসে না। কাজেই কেউ এলে-টেলে লোকে তাকে সহজে ভোলে না।

এতক্ষণে মনে পড়ল বিভূতিবাবুর পড়শী ইন্দুবাবুর কথা। ইন্দুবাবু? তিনি মারা গেছেন। ইস, তাঁর মেয়ে হাসপাতালে নার্সের কাজ করত, ভারি সুন্দর গানের গলা—তার সঙ্গে দেখা করে আসা হল না।

নতিডাঙার আজাহার মণ্ডল যে বেঁচে থাকবে না, সেটা আমার হিসেবের মধ্যে ধরাই ছিল। তখনই তো বলেছিল তার বয়স দুই কম একশো। সে কি আজকের কথা? মাদার মণ্ডলও যে মারা গেছে সেটা কবরেজমশাইয়ের কাছে শুনলাম। চায়ের দোকানে বসে আজাহারের সেই নীলচাষের আমলের গল্প কখনও ভুলব না। তেলের সের তিন আনা আর সাতহাতি ধুতিও তিন আনা। ছেলেবেলায়

নীলের ভ্যাটে পড়ে যাওয়ার গল্প। তার ঈদের চাঁদের মত সাদা দাড়ি আর ফোকলা দাঁতের ভুবনভোলানো হাসি।

মাদার মণ্ডল বলেছিল মহাজনদের কাছে করজা করে চাষীদের সর্বস্ব হারানোর গল্প।

অনুশীলনী

• বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'অপুদুর্গার জগৎ' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন? সেই জগতের এখন অবস্থা কি, এই রচনাটি অবলম্বন করে সংক্ষেপে লেখো।

২. 'আমরা সোজা গিয়ে উঠলাম মাস্টারমশাই ফণী চক্কোত্তির বাড়িতে।' ফণী চক্কোত্তি তাঁর সঙ্গে বিভূতিভূষণের কি সম্পর্ক ছিল? তিনি বিভূতিভুষণ সম্পর্কে লেখককে কি বলেছিলেন?

৩. 'অপুদুর্গার জগৎ কত যে বদলে গেছে ভাবাই যায় না।'—অপুদুর্গার জগৎ-এর এই পরিবর্তনের পরিচয় দাও।

•ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'সবাই খেয়ে পরে সুখে আছে—এমন দিন কি দেখে যেতে পারব না? —কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অন্তর্গত? উদ্ধৃত অংশটির অর্থ বিশ্লেষণ করো।

২. 'এত অভাব-অনটনের মধ্যেও এই স্নেহ-মমতাগুলো গ্রামদেশে তাহলে টিঁকে রয়েছে। দেখে বেশ ভাল লাগল।'—কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অংশ? লেখকের বক্তব্যটি বিশেষভাবে বুঝিয়ে লেখো।

• সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'পথের পাঁচালীর অপুর জায়গা। বিভূতিভূষণের ভিটে।'—পথের পাঁচালী কি? অপু কে? 'বিভূতিভূষণের ভিটে'র পরিচয় দাও।

২. 'তাঁর ছিল একটাই দোষ'- বক্তা কে? তিনি কার দোষের কথা বলেছেন? দোষটা কি?

৩. 'চিরকালের সেই হচ্ছে হবে'—কোন্ প্রসঙ্গে লেখক একথা বলেছেন? কেন বলেছেন?

৪. 'এই ফুল বিভূতিভূষণের খুব প্রিয় ছিল'—কোন্ ফুল? সেই ফুলের অন্যত্র নাম কি? কেন?

৫. 'এই গ্রামে আর ঘেঁটুফুল নেই'—ঘেঁটুফুলের কথা উঠল কেন? সে ফুল কোথায় গেল?

৬. 'এরপর সমবায়ের নাম শুনলে লোকে কানে আঙুল দেবে'—কোন্ প্রসঙ্গে লেখক এই কথা বলেছেন? সমবায়ের নাম শুনলে লোকে কানে আঙুল দেবে কেন?

৭. বিভূতিবাবুর পড়শী ইন্দুবাবু, নতিডাঙার আজাহার মণ্ডল, মাদার মণ্ডল –এদের কথা লেখক কেন স্মরণ করেছেন?

৮. টীকা লেখো: দীনবন্ধু মিত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

● **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. অর্থ লেখো ও বাক্যে প্রয়োগ কর: পিঠোপিঠি, ভাঁটা পড়া, খচখচ করা, বিরল, অন্দর-মহল, আধুনিক, আখের, প্রাতঃস্মরণীয়দের, লঙ্গরখানা, নীলের ভ্যাট, ভুবনভোলানো হাসি।

২. পদ পরিবর্তন কর: অপুষ্টি, অস্বাভাবিক, রক্তহীনতা, পাণ্ডুরতা, বিদ্যুৎ, বিরল, উর্ধ্ব, সঞ্চয়ী, অঞ্চল, দোকান, হিসেব।

৩. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: অস্বাভাবিক, আধ-খাওয়া, বাল্যবন্ধু, স্মৃতিরক্ষা, প্রাতঃস্মরণীয়, মরণদশা, নীলচাষ, ভুবনভোলানো, মহাজন।

৪. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো: ফর্সা, পটু, প্রবাস, আধুনিক, কার্পণ্য।

৫. শূন্যস্থান পূরণ কর: উঁচু দাওয়া, মাটির দেয়াল,—চাল। বাঁশের গায়ে ঝোলানো থেলো—। যা আজকাল গাঁয়ের দিকেও ক্রমশ—হয়ে আসছে। হুঁকো—তামাক—, কে আর অত—করে।

রাম ভরত মিলন
কৃত্তিবাস ওঝা

কবি ঃ প্রাচীন কবিগণের মধ্যে কৃত্তিবাস ওঝা অন্যতম শ্রেষ্ঠ। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ কাব্যের ভাবানুসরণে রচিত তাঁর 'রাম-পাঁচালী' বা 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজমান। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালীর জীবনবেদ। কৃত্তিবাস প্রাচীন কবি হলেও তাঁর কাব্য আজও সমানভাবে সমাদৃত। []

তাঁর কাব্য ঃ মধুসূদন কৃত্তিবাসকে 'কার্তিবাস' বলে গৌরবদান করে মন্তব্য করেছেন—তিনি 'এ বঙ্গের অলঙ্কার'। অলঙ্কারই বটে। বাংলা ভাষা-ভাষী এমন কে আছেন যিনি কৃত্তিবাসের নাম শোনেন নি বা তাঁর রামায়ণের এক ছত্রও পাঠ করেন নি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল—লোকশিক্ষা। যুগ যুগ ধরে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সেই সুমহান ব্রত পালন করে আসছে। উচ্চ জীবনাদর্শ, গভীর মূল্যবোধ, মহৎ দৃষ্টান্ত—এই সমস্ত কিছুর উৎসস্থল রামায়ণী কথা। লোকপ্রিয় কবির রাম-পাঁচালী থেকে 'রাম-ভরত মিলন' কাব্যাংশটি সঙ্কলিত হয়েছে। ভরতের অতুলনীয় ভ্রাতৃভক্তির কথা সুবিদিত। এখানে সেই মহাপুরুষের চরিত্রের উজ্জ্বল ভ্রাতৃভক্তির একটি অনুপম চিত্র বর্ণিত হয়েছে। []

মুনি বলে—শ্রীরামের জানি সবিশেষ।
দেখা পাবে কিন্তু রাম যাবেন না দেশ ॥
চিত্রকূট পর্বতে আছেন রঘুবীর।
তথা গেলে দেখা হবে এই জ্ঞান স্থির ॥
অন্য অন্য মুনিগণ দিলে তাহে সায়।
ভরতের সৈন্যগণ চিত্রকূটে যায় ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্মাইয়া পর্ণশালা॥
তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
জানকী তাহার মধ্যে লক্ষ্মণ বাহির॥
হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশে।
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে॥
গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর।
পথ-পর্যটনে অতি মলিন শরীর॥
পড়িলেন শ্রীরামের চরণকমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে॥
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন॥
বামা জাতি স্বভাবতঃ বামা বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে॥
অপরাধ ক্ষমা কর চল প্রভু দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃ ক্লেশ॥
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার॥
চল প্রভু অযোধ্যায় লহ রাজ্যভার।
দাসবৎ কর্ম করি আজ্ঞা অনুসার॥
শ্রীরাম বলেন—তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল এ নহে উচিত॥
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতার।
বনে আইলাম আমি আজ্ঞায় পিতার॥
চতুর্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবা প্রত্যক্ষ॥

যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়॥
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে।
কোন্ শত্রু আপদ ঘটাবে কোন্ ক্ষণে॥
তোমারে জানাব কত আছে যে বিদিত।
বিবেচনা করিবা সর্বদা হিতাহিত॥
চতুর্দশ বৎসর জানহ গতপ্রায়।
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায়॥
যোড় হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমনে রাখিব রাজ্য মম কার্য নয়॥
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা॥
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে।
ত্রিভুবনে আমার কি করে কার ডরে॥
শ্রীরাম বলেন—হে ভরত প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক॥
নন্দীগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য।
সাবধান হইয়া পালিহ পিতৃরাজ্য॥
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে॥
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায়॥

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'ভরত কহেন ধরি রামের চরণ'—
'শ্রীরাম বলেন—তুমি ভরত পণ্ডিত'—

উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহযোগে রাম-ভরতের কথোপকথন বর্ণনা কর।

২. 'ভরত ও রাম চরিত্র-মাহাত্ম্যে দুইজনই আদর্শস্থানীয়।'—রাম-ভরতের চরিত্র আলোচনা করে এই কথার সত্যতা নিরূপণ কর।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার ॥—

কোন্ কবির কোন্ রচনা থেকে অংশটি গৃহীত? অংশটির সরলার্থ বুঝিয়ে লেখ।

২. মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতার।
বনে আইলাম আমি আজ্ঞায় পিতার ॥

কোন্ কবির কোন্ রচনা থেকে অংশটি গৃহীত? অংশটির বক্তব্য সহজ-ভাষায় বুঝিয়ে লেখ।

৩. তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে।
ত্রিভুবনে আমার কি করে কার ডরে ॥

—কোন্ কবির কোন্ রচনা থেকে অংশটি গৃহীত? বক্তা কে? তাঁর বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করে লেখ।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'মুনি বলে'—মুনি কে? তিনি কি বললেন?

২. 'বামা জাতি স্বভাবতঃ বামা বুদ্ধি ধরে'—কার উক্তি? 'বামা জাতি' কি? 'বামা বুদ্ধি' কি? বক্তা এখানে কোন্ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?

৩. 'চারিভাই একত্র হইব অযোধ্যায়।'—বক্তা কে? 'চারিভাই' কে কে? কিভাবে, কখন তাঁরা অযোধ্যায় একত্র হবেন?

৪. 'পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়'—কে, কার কিভাবে 'পাদুকার অভিষেক' করলেন? 'তথায়'—কোথায়?

● **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. গদ্যরূপ লেখ: নির্মাইয়া, তাঁরে, আইলাম, তাহে, যেমনে, পালিবারে, ডরে, পালিহ।

২ শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর: সবিশেষ, বসতি, দীনবেশ, গলবস্ত্র, পর্যটন, দেশান্তর, বিদিত, ক্লেশ, দাসবৎ, হিতাহিত, পাদুকা, অভিষেক।

৩. সন্ধিবিচ্ছেদ কর: পর্যটন, দেশান্তর, সিংহাসন, চতুর্দশ, হিতাহিত, প্রাণাধিক।

৪. পদ পরিবর্তন কর: দেশ, স্থির, প্রবেশ, শরীর, দেশান্তর, পণ্ডিত, উচিত, শূন্য, অভিষেক, পুলকিত।

৫. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: পর্ণশালা, দীনবেশ, চরণকমল, দেশান্তর, সিংহাসন, শত্রুঘ্ন, অযোধ্যাভূষণ, পিতৃবাক্য, হিতাহিত, ত্রিভুবন, রাজকার্য, পিতৃরাজ্য।

৬. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর: অন্য অন্য **মুনিগণে** দিল তাহে সায়। কার **বাক্যে** রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন। **আনন্দে** শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে। **সিংহাসন** শূন্য আছে। চলিলেন ভরত শ্রীরামের **আজ্ঞায়**।

৭. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ধারণ কর: বসতি, আগমন, বুদ্ধি, অনুযোগ, পুলকিত।

৮. বিপরীতার্থক শব্দ লেখ: স্থির, প্রবেশ, মলিন, পণ্ডিত, প্রত্যক্ষ, শূন্য।

পরীক্ষা

কাশীরাম দাস

কবি : কৃত্তিবাস ওঝার মতোই মধ্যযুগের আর এক জনপ্রিয় ও প্রীতিভাজন কবি কাশীরাম দাস। কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলায় সিঙ্গি গ্রামে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কাশীরাম মহাকবি ব্যাসদেব বিরচিত মহাভারত মহাকাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন। মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে স্বীকৃত কবি কাশীরাম দাস।' []

তাঁর কাব্য : মধুসূদন একটি সনেটে বলেছেন : 'হে কাশী! কবীশদলে তুমি পুণ্যবান।' অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি—এই অর্থে কবীশ ; এবং মহাভারতের মতো মহৎ কাব্য অনুবাদ করেছিলেন—এইজন্য 'পুণ্যবান' কবি কাশীরাম। কাশীরাম অত্যন্ত শক্তিমান ও বিদ্বান কবি ছিলেন। নতুবা মহাভারতের মতো অমন বৃহৎ, জটিল ও অনুপম কাব্যের অনুবাদ করতে পারতেন না তিনি। কাশীরাম দাসের কাব্য রচনারও মূল উদ্দেশ্য ছিল—লোকশিক্ষা। 'পরীক্ষা' অংশটি কাশীদাসী মহাভারতের একটি অংশ। ঐকান্তিকতা বা নিষ্ঠা না থাকলে যে মানুষ কোনো কাজে বা কোনো পরীক্ষাতেই সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, এই কাহিনীতে সেই কথাই বলা হয়েছে। কৌরব ও পাণ্ডব ভ্রাতাদের মধ্যে ছেলেবেলা থেকে অর্জুনই ছিলেন সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠাবান ও একাগ্রচিত্ত। সেইজন্য পরিণত বয়সে তিনি ভারতশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা হতে পেরেছিলেন। খুব সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় রচিত কাশীরামের মহাভারতের সেই কাহিনীটিই এখানে সঙ্কলিত হয়েছে। []

একদিন দ্রোণাচার্য বিদ্যা পরীক্ষিতে।
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষী রাখেন বৃক্ষেতে॥

একে একে ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
আইলেন যুধিষ্ঠির আগে সেইক্ষণে॥
ধনুঃশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির-করে।
ভাসপক্ষী দেখাইয়া কহেন তাহারে॥
ঐ দেখ ভাসপক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ্য ধর ধনুঃশর॥
যেইক্ষণে মোর আজ্ঞা হইবে বাহির।
সেইক্ষণে কাটিবা উহার তুমি শির॥
এত শুনি ধনুঃশর যুড়ি যুধিষ্ঠির।
ভাসপক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির॥
ডাকিয়া বলেন দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি পাও দেখিবারে॥
ধর্ম কহিলেন, ভাস দেখি বৃক্ষ 'পরে।
ভূমিতে তোমারে দেখি, আর সহোদরে॥
এত শুনি' দ্রোণ তারে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড় ছাড় বলি ধনু নিলেন কাড়িয়া॥
দুর্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর।
একে একে সবারে দিলেন ধনুঃশর॥
যেইরূপ কহিলেন ধর্মের নন্দন।
সেইমত কহিলেন সব ভ্রাতৃগণ॥
সবাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোণ বীর।
ধনু লৈয়া ঠেলা মারি করেন বাহির॥
ধনুঃশর দেন গুরু অর্জুনের হাতে।
বৃক্ষে ভাস দেখাইয়া কহেন অগ্রেতে॥
নির্গত হইবামাত্র মম মুখে বাণী।
নিঃশব্দে কাটিবা শির ধনুঃশর হানি'॥

গুরুবাক্যে তখনি টানিয়া ধনুর্গুণ।
পক্ষী প্রতি দৃষ্টি করি' রহেন অর্জুন॥
কতক্ষণ থাকি' দ্রোণ বলেন অর্জুনে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি দেখহ নয়নে॥
অর্জুন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষমধ্যে সবে দেখিবারে পাই পাখি॥
হৃষ্ট হৈয়া দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন।
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ॥
অর্জুন বলেন, আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আঁখি।
দ্রোণ বলিলেন, অস্ত্রে কাট পক্ষিশির।
না স্ফুরিতে বাক্যমাত্র কাটে পার্থবীর॥
দ্রোণাচার্য নিরখিয়া হরষিত মন।
আলিঙ্গিয়া পুনঃ পুনঃ করেন চুম্বন॥
প্রশংসা করেন দ্রোণ অর্জুনে অপার।
দেখি চমৎকার হৈল সকল কুমার॥

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'পরীক্ষা' কাব্যাংশে পাণ্ডব ও কৌরব ভ্রাতাদের অস্ত্রপরীক্ষার কাহিনীটি সংক্ষেপে লেখ। এই কাহিনী থেকে অর্জুনের চরিত্র সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা হয়?

২. দ্রোণ কে? তিনি রাজপুত্রদের অস্ত্রপরীক্ষা নিয়েছিলেন কেন? এই পরীক্ষার ফলাফল কি হয়েছিল?

৩. 'দেখি চমৎকার হৈল সকল কুমার।'—এখানে 'চমৎকার' কথাটির অর্থ কি? 'সকল কুমার' কারা? তাঁরা কি দেখে এবং কেন 'চমৎকার' হয়েছিলেন?

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. অর্জুন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষমধ্যে সবে দেখিবারে পাই পাখি ॥

কোন্ কবির কোন্ কাব্যাংশ থেকে গৃহীত ? উদ্ধৃতাংশটির বক্তা কে ? তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. "ভাসপক্ষী দেখাইয়া কহেন, তাহারে'—'ভাসপক্ষী' কি ? কে কাকে 'কহেন' ? কি 'কহেন' ?

২. 'এত শুনি' দ্রোণ তারে অনেক নিন্দিয়া'—দ্রোণ কি শুনলেন ? তিনি কাকে, কেন নিন্দা করলেন ?

৩. "...... . ...আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ডসহ দুই আঁখি।'

—বক্তা কে ? কাকে উদ্দেশ্য করে তিনি কি বললেন ? তাঁর এইরূপ বক্তব্যের মধ্যে তাঁর চরিত্রের কি গুণ প্রকাশ পেয়েছে ?

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. গদ্যরূপ লেখ : পরীক্ষিতে, রচিয়া, মোর, আইলেন, যুড়ি, নিন্দিয়া, সবারে, স্ফুরিতে, হরষিত, আলিঙ্গিয়া।

২. পদ পরিবর্তন কর : লক্ষ্য, দৃষ্টি, ধর্ম, বচন, হরষিত, অর্জুন, কুমার।

৩. শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর : ভাসপক্ষী, শির, ধনুঃশর, আজ্ঞা, নন্দন, ধনুর্গুণ, নয়ন, বচন।

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ কর : যুধিষ্ঠির, সহোদর, দুর্যোধন, ধনুর্গুণ, নির্গত, প্রশংসা, নিরীক্ষণ।

৫. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : ভাসপক্ষী, যুধিষ্ঠির, ধনুঃশর, ধনুর্গুণ, বৃকোদর।

৬. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : একে একে ডাকিলেন সব **শিষ্যগণে**। **নিঃশব্দে** কাটিয়া শির ধনুঃশর হানি'। কোন্ কোন্ **জনে** তুমি দেখহ **নয়নে**। **অস্ত্রে** কাট শির। প্রশংসা করেন দ্রোণ **অর্জুনে** অপার।

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা

ভারত চন্দ্র রায়

কবি ঃ রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র (১৭১২—১৭৬০) নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর মত রূপদক্ষ এবং ছন্দ-সুদক্ষ কবি মধ্যযুগেই নয় কেবল, একালেও বিরল। তিনি তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কত বিচিত্র প্রকার ছন্দ ও অলংকারের ব্যবহার করেছেন যা আজো আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ভারতচন্দ্রের পদবী রায় ; কিন্তু তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-প্রদত্ত উপাধি 'রায়গুণাকর' নামেই বাংলা ভাষায় অধিক পরিচিত। []

তাঁর কাব্য ঃ ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। ছান্দসিক ও অলংকরণদক্ষ কবি ভারতচন্দ্র বাংলা কাব্যের একজন প্রধান স্থপতি। তিনি তাঁর কাব্যে বহু প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ করেছিলেন ; যথা—তূণক, তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, শার্দুল-বিক্রীড়িত প্রভৃতি। এই কাব্যাংশটি অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত এবং ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে রচিত। কবিতাটির পটভূমি এই ঃ শিব সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ—দক্ষ তাঁর জামাতার এই গৌরব সহ্য করতে পারতেন না। এইজন্য তিনি এক শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেন। শিব, এমনকি কন্যা সতীকেও তিনি সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নি। শিবের অনুমতি না পেয়েও সতী কিন্তু সেই যজ্ঞে যোগদানের জন্য পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন। দক্ষ কন্যাকে শুনিয়ে বিস্তর শিবনিন্দা করলেন। সতী স্বামীর নিন্দা সইতে না পেরে যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। শিব সেই খবর পেয়ে শোক ও ক্রোধে অধীর উন্মত্ত হয়ে ভূত-প্রেত-ভৈরব-যক্ষ-রক্ষঃ প্রভৃতি পরিবৃত হয়ে দক্ষালয়ে যাত্রা করলেন—দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করবেন, এই উদ্দেশ্যে। কাব্যাংশটি মূলত আবৃত্তির জন্য প্রদত্ত হয়েছে। []

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।

দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে ॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা ॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্তকেশে ॥
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥ (সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

[কবিতাটি কিভাবে আবৃত্তি করতে হবে :

মহারুদ্ররূপে / মহাদেব সাজে /
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ / শিঙা ঘোর বাজে /
লটাপট জটাজুট / সংঘট্ট গঙ্গা /
ছলচ্ছল টলট্টল / কলক্কল তরঙ্গা /...

কবিতাটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন জটিল শব্দপ্রয়োগের অর্থ : জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা—শিবের জটায় গঙ্গা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; শিবজটা থেকে মুক্তি পেয়ে গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণা হন। ফণীফন্ন গাজে—শিবের জটাস্থ সাপ গর্জন করছে। দিনেশ—দিন+ঈশ=দিনের ঈশ্বর বা সূর্য। দিনেশ··· সাজে—শিবের ললাটস্থ নিশানাথ বা চন্দ্র সূর্যের তেজে জলে উঠেছে, কেননা শিব ক্রুদ্ধ হয়েছিল। সর্পবাণা—সাপগুলো গর্জন করতে করতে বাণা বা নিশানের

মত উড়ছে। ভৈরবা ....ত্রিশৃঙ্গী—শিবের অনুচরবৃন্দ। ভূজঙ্গপ্রয়াতে—একটি সংস্কৃত ছন্দের নাম।]

- **বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী**

১. শিবের দক্ষালয়যাত্রার একটি বর্ণনা দাও নিজের সহজ ভাষায়। শিবের অনুচররা কিভাবে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করল ?

২. 'শিবের দক্ষালয়যাত্রা' কাব্যাংশ থেকে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত কর এবং সেগুলির মধ্যে থেকে পাঁচটি দিয়ে পৃথক পৃথক বাক্য গঠন কর।

- **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী**

ভূজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

—কোন্ কবির কোন কবিতার অংশ ? পংক্তিটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

- **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী**

১. শিবের সাজসজ্জার বিবরণ দাও। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কারা চলেছে ?

২. অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥

—মহারুদ্র কে ? দক্ষ কে ? সতী কে ? মহারুদ্র দক্ষকে সতীকে দিতে বলছেন কেন ?

- **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. শব্দার্থ লেখো : মহারুদ্র, সংঘট্ট গঙ্গা, ফণীফন্ন, গাজে, সর্পবাণা, ত্রিশৃঙ্গী, মুক্তকেশে, তরাসে।

২ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : মহারুদ্র, নিশানাথ, মহাশব্দ; দক্ষযজ্ঞ, অদূর।

৩. পদ পরিবর্তন কর : গঙ্গা, প্রতাপ, ভূত, যজ্ঞ, নাশ, গভীর।

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ কর : ছলচ্ছল, দিনেশ, যজ্ঞ।

৫. গদ্যরূপ দাও : গাজে, ভালে, সবে, তরাস।

ফুলকপি

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত

কবি ঃ মহাকবি মধুসূদন দত্তের পূর্ব-যুগের কবি-শ্রেষ্ঠ বাঙালী-কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। ইনি সেকালের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদকও ছিলেন। বিষয়, ভাব, ভাষা—সব দিক থেকেই ঈশ্বর গুপ্ত একেবারে পুরোপুরি স্বদেশী কবি। তাঁর কবিতায় বিদেশী ভাব ও চিন্তার বাষ্পমাত্র নেই। লঘু, রঙ্গব্যঙ্গপূর্ণ কবিতা রচনায় কবি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আনারস, এণ্ডা-ওয়ালা, তপসে মাছ, পাঁঠা, ফুলকপি প্রভৃতি কবিতাগুলি এইদিক থেকে বেশ উপভোগ্য। []

তাঁর কাব্য ঃ ঈশ্বর গুপ্ত খাদ্য-বিষয় নিয়ে অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। 'ফুলকপি' তেমনি একটি কবিতা। কবিতাটি আগাগোড়া লঘু সুর ও কৌতুকে ভরা। এ ধরনের কবিতা-লেখায় ঈশ্বরচন্দ্রের কোন জুড়ি নেই। সহজ প্রকাশভঙ্গি, অলংকারপ্রিয়তা এবং তুচ্ছ-সাধারণ বিষয় নির্বাচনে ঈশ্বরগুপ্ত অনন্য, একেবারে খাঁটি বাঙালী। ফুলকপি যে খুব সুস্বাদু সবজী—এটুকু বলেই কবি ক্ষান্ত হননি। সুযোগমতো ফুলকপি-অনুরাগী এবং বিরাগী উভয় শ্রেণীকে-নিয়েই কবি কিছুটা রঙ্গব্যঙ্গ করতেও ছাড়েন নি। []

মনোহর ফুলকপি পাতাযুক্ত তায়।
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায় ॥
শ্রেণীবদ্ধ চারুশোভা এলো আর বাঁধা ॥
সাহেবেরা প্রেমডোরে চিরকাল বাঁধা ॥
রন্ধনেতে তার সঙ্গে যুক্ত হলে কই।
যত পাই তত খাই আরো বলি কই
ঘৃণার স্বভাবে যে নাহি খায় কপি।
তারে কি মানুষ বলি নিজে সেই কপি ॥
কপির সকলি গুণ দোষ কিছু নাই।
তাতেই আমোদ বাড়ে যে রূপেতে খাই ॥

অনুশীলনী

• সাধারণ প্রশ্নাবলী

১. কবি ফুলকপির যে প্রশস্তি গেয়েছেন, তা নিজের ভাষায় লেখো। যারা কপি-অনুরাগী নয়, তাদের সম্পর্কে কবি কি মন্তব্য করেছেন ?

• ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. শ্রেণীবদ্ধ চারুশোভা এলো আর বাঁধা।
সাহেবরা প্রেমডোরে চিরকাল বাঁধা ॥

—কোন্ কবির কোন্ কবিতা থেকে অংশটি নেওয়া হয়েছে ? কবির বক্তব্যটি বুঝিয়ে লেখো।

২. ঘৃণার স্বভাবে যে নাহি খায় কপি।
তারে কি মানুষ বলি নিজে সেই কপি ॥

—কোন্ কবির কোন্ কবিতা থেকে অংশটি নেওয়া হয়েছে ? অংশটির অর্থ সুপরিস্ফুট কর।

• সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'সাহিনের কাবা যেন বাবুদের গায়।' —কাকে দেখে কবির এরকম মনে হয়েছে ? এরকম তুলনা মনে হওয়ার কারণ কি ?

২. 'রন্ধনেতে তার সঙ্গে যুক্ত হলে কই।'—কার সঙ্গে ? কই যুক্ত হলে কি অবস্থা হয় ?

• ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. এই কবিতায় বাঁধা, কই, কপি—এই শব্দগুলি দু'বার করে ব্যবহৃত হয়েছে। এদের দু'রকম অর্থ কি ?

২. পদ পরিবর্তন কর : মনোহর, বাবু, শ্রেণীবদ্ধ, চিরকাল, ঘৃণা, স্বভাব, গুণ, দোষ।

৩. অর্থ লেখো ও বাক্যে প্রয়োগ কর : মনোহর, চারুশোভা, প্রেমডোর, স্বভাব, আমোদ।

৪. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : ফুলকপি, শ্রেণীবদ্ধ, চারুশোভা, প্রেমডোর, চিরকাল।

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ কর : মনোহর।

৬. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : সাহেবরা **প্রেমডোরে** চিরকাল বাঁধা। ঘৃণার **স্বভাবে** যে নাহি খায় কপি। **তাতেই** আমোদ বাড়ে।

বীরবাহুর পতনে রাবণের বিলাপ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি ঃ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। প্রথম সার্থক নাট্যকার ও প্রহসন লেখকও তিনি। যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাস করে এসেছিলেন। প্রথম জীবনে বিদেশী মহাকবিদের অনুসরণে ব্রতী হয়েছিলেন ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনায়। পরে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বহুভাষাবিদ্ কবি বাংলা ভাষায় গীতিকবিতা, সনেট, পত্রকাব্য প্রভৃতি এবং ইংরেজী Blank Verse-এর অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। অসামান্য প্রতিভাবান সৃষ্টিশীল এই কবি ছিলেন যুগন্ধর। শ্রেষ্ঠ রচনা ঃ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদাবলী, শর্মিষ্ঠা নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসন প্রভৃতি।

তাঁর কাব্য ঃ মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মেঘনাদবধ কাব্য। এই মহাকাব্যে কবি রামচন্দ্রের পরিবর্তে রাবণকে নায়কের মর্যাদা দান করেছেন। দৈবানুগ্রহ-নির্ভর ও সংগ্রামবিমুখ রামচন্দ্রের চেয়ে আত্মশক্তি পৌরুষ ও মানবিকতায় সমুজ্জ্বল রাক্ষসরাজ রাবণের চরিত্রকে মহিমামণ্ডিত করে তুলেছেন। আলোচ্য কাব্যাংশে বীর রাবণের পিতৃসত্তার এক অপূর্ব আলেখ্য রচনা করেছেন কবি। সেইসঙ্গে রাবণের দেশপ্রেমিক সত্তারও গভীর পরিচয় ফুটে উঠেছে এই অংশটিতে। মেঘনাদবধ কাব্যেই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ-রচনায় পুরোপুরিভাবে সফল হন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাহায্যে বীররস ও করুণরস উভয় রসই কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হন। ছন্দের গতিময় প্রবাহ, বর্ণাঢ্যতা, গাঢ়ত্বে অত্যন্ত আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে এই অংশটি। []

পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, প'ড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে'?—উক্তিটি কার? তিনি কার উদ্দেশ্যে এই কথা বলেছেন? তাঁর বক্তব্য গুছিয়ে লেখ।

২. 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে / প্রচেতঃ!'—'প্রচেতঃ' শব্দের অর্থ কি? 'প্রচেতঃ সুন্দর মালা পরিয়াছ'—বক্তার এই উক্তির মধ্যে কি অর্থ লুকিয়ে আছে? 'প্রচেতঃ'কে সম্বোধন করে বক্তা কি বললেন?

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'চাপি রিপুচয় বলী..........রক্ষিতে কৌরবে'।—কোন্ কবির কোন্ কাব্যের অংশ এটি? কবির বক্তব্যটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে লেখ।

২. 'জন্মভূমি-রক্ষাহেতু.........ফুল-সম।'—কোন্ কবির কোন্ কাব্যের অংশ এটি? বক্তার বক্তব্যবিষয় নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লেখ।

৩. 'কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে/বীতংসে?'—কোন্ কবির কোন্ কাব্যের অংশ এটি? বক্তার বক্তব্যবিষয় বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে লেখ।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'এইরূপে আক্ষেপিয়া'—কে আক্ষেপ করছিলেন? কেন আক্ষেপ করছিলেন?

২. 'দেখিলেন, দূরে/সাগর মকরালয়'—কে দেখলেন? কি দেখলেন?

৩. 'অধম, ভালুকে/শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, ফেলে তার লয়ে'—কে, কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন? কেন করেছেন?

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. শব্দার্থ লেখ: বীরচূড়ামণি, রিপুচয়, স্নেহনীড়, কালপৃষ্ঠধারী, একাগ্নী-বাণ, শোকাকুল, বীর-কুল-সাধ, রিপুদলবলে, মোহমদে, অন্তর্যামী, অক্ষম, লীলাস্থলী, জগত-পিতা, বীরেন্দ্র-কেশরী, সাগর-মকরালয়, মেঘশ্রেণী, অচল, শিলাকুল, তরঙ্গনিচয়, ফণিরব, নির্ঘোষ, অপূর্ব-বন্ধন, বীরকুলর্ষভ, বলী, সিন্ধু, প্রচেতঃ, জলদলপতি, অলঙ্ঘ্য, অজেয়, ভূষণ, রত্নাকর, প্রভঞ্জনবৈরী, ভীম-পরাক্রমে, নিগড়, অধম, যাদুকর, কেশরী, রাজপদ, বীতংস, হৈমবতী, নীলাম্বুস্বামী, কৌস্তভ, জাঙাল, অপবাদ, রিপু, বারীন্দ্র, মিনতি।

২. সন্ধি বিচ্ছেদ কর : শোকাকুল, অন্তর্যামী, মকরালয়, শয়ন, রত্নাকর, নীলাম্বু, নির্দয়, বারীন্দ্র।

৩. গদ্যরূপ দাও : রক্ষিতে, ভয়ে, যাতনা, কেমনে, আক্ষেপিয়া, উথলিছে, বরিষা, কহ, শোভে, রতন, এবে, ভালে, মম।

৪. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : বীরচূড়ামণি, স্নেহনীড়, কালপৃষ্ঠধারী, মহাশোকে, শোকাকুল, বীর-কুল-সাধ, জন্মভূমি, বজ্র-আঘাত, অন্তর্যামী, নীলাম্বুলী, মেঘশ্রেণী, মহামানী, বলী, অলঙ্ঘ্য, অজেয়, রত্নাকর, প্রভঞ্জনবৈরী, যাদুকর, রাজপদ, নীলাম্বুস্বামী, নির্দয়, কলঙ্করেখা।

৫. পদ পরিবর্তন কর : বলী, পালিত, শোকাকুল, কুমার, মূঢ়, ভীরু, কোমল, কাতর, অক্ষম, অচল, দৃঢ়, প্রশস্ত, মহামানী, সিন্ধু, অলঙ্ঘ্য, অজেয়, বৈরী, পাপ, নির্দয়, অপবাদ।

৬ প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ধারণ কর : পালিত, কৌরব, শয়ন, মুগ্ধ, দুঃখী, সাগর বলী, অলঙ্ঘ্য, অজেয়, দাশরথি, যাদুকর, অপবাদ।

৭ স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : হিড়িম্বার **স্নেহনীড়ে** পালিত গরুড় ঘটোৎকচ। বীর-কুল-সাধ এ **শয়নে** সদা! এ **বজ্র-আঘাতে** কত যে কাতর……। কিন্তু সদা **পুত্রদুঃখে** দুঃখী। কোন্ **গুণে** দাশরথি কিনেছে তোমারে। কেশরীর **রাজপদ** কার সাধ্য বাঁধে **বীতংসে**। ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল **রিপু**।

কবির অন্ধদশা

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩) মধুসূদন-পরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অনুসরণে হেমচন্দ্রও 'বৃত্রসংহার' নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম—চিন্তাতরঙ্গিণী, বীরবাহু কাব্য, কবিতাবলী। তাঁর রচিত 'ভারত সংগীত' কবিতাটি একসময় দেশবাসীর মনে গভীর স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করেছিল। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভা যেমনই হোক পদ্য লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। বাঙ্গলা কাব্যে হেমচন্দ্রের বিশেষ দান হইল স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনা সঞ্চার।' শেষ বয়সে কবি অন্ধত্ব লাভ করেছিলেন। []

তাঁর কবিতা : হেমচন্দ্র-মধুসূদন-নবীনচন্দ্র ত্রয়ী কবিরূপে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। মধুসূদনের মতো প্রতিভাবান না হলেও হেমচন্দ্র শক্তিমান কবি ছিলেন। আলোচ্য কবিতাটি তাঁর 'কবিতাবলী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। বার্ধক্যে কবি অন্ধদশা লাভ করেন। একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অন্ধত্ব লাভ করলে জগৎ ও জীবন তাঁর কাছে কিরূপে প্রতিভাত হয়, এই কবিতায় কবি সেই মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা অশ্রুর অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বস্তুত, বাংলা কাব্যসাহিত্যে এমন করুণ রসাত্মক লিরিক কবিতা আর দ্বিতীয় নেই। []

বিভু! কি দশা হবে আমার
একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচাইলে ভবের স্বপন!
সব আশা চূর্ণ ক'রে রাখিলে অবনী 'পরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন!
জীবনে বাসনা যত সকলই করিলে হত
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী;

না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাণ্ডার
চির-অস্তমিত দিনমণি !
ধরা, শূন্য, স্থল, জল, অরণ্য, ভূমি, অচল,
না থাকিবে কিছুরি বিচার ;
না রবে নয়নে দৃষ্টি তমোময় সব সৃষ্টি
দশদিক ঘোর অন্ধকার—
বিভু ! কি দশা হবে আমার !
প্রতিদিন অংশুমালী সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে ;
আমার রজনী শেষ হবে না কি, হে ভবেশ !
জানিব না দিবা কারে বলে ?
আর না সুধার সিন্ধু আকাশে দেখিব ইন্দু ;
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জ্বলে,
শিশির বসন্তকাল, আসে যাবে চিরকাল
আমি না দেখিব কোন কালে।
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, নর; জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে পাব বা দেখিতে নেত্রে
দেব-তুল্য মানব-বদন ।
নিজ কন্যা-পুত্র মুখ পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপুর্ব ভাবের চিত্র, থাকিবে স্মরণ মাত্র
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা ।
কি নিয়ে থাকিব তবে, সিদ্ধ কি সাধনা হবে ?
ভবলীলা ঘুচেছে আমার ;
জীবনের শেষ কালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়ে দুঃখে কর পার—
বিভু ! কি দশা হবে আমার !

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'কবির অন্ধদশা' কবিতাটি কবি কোন্ সময়ে লিখেছিলেন ? দৃষ্টি-শক্তিহীন কবির গভীর আক্ষেপ ও খেদ কবিতাটিতে কিভাবে, কতখানি ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় লেখ।

২. 'জীবনের শেষকালে,/সকলি হরিয়া নিলে'—কবি কার উদ্দেশ্যে এই অভিযোগ করেছেন? 'সকলি' বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন? 'জীবনের শেষকালে'—অর্থাৎ কখন ? 'সকলি হরিয়া' নেওয়ায় তাঁর কি ক্ষতি হয়েছে ?

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'জীবনে বাসনা যত/সকলই করিলে হত/অন্ধকারে ডুবায়ে আপনি ;/না পার দেখিতে আর,/ভবের শোভা-ভাণ্ডার/চির অস্তমিত দিনমণি'— কোন্ কবির লেখা ? কোন্ কবিতার অংশ এটি ? কবি এই ছত্রগুলিতে কি বলতে চেয়েছেন, বুঝিয়ে লেখ।

২. 'প্রতিদিন অংশুমালী..... জানিব না দিবা কারে বলে ?'— কবিতার নাম কি ? কবি কে ? এই অংশটিতে তিনি কি বলেছেন, তোমার ভাষায় গুছিয়ে লেখো।

৩. 'অপূর্ব ভাবের চিত্র......মনের কল্পনা'— কোন্ কবির লেখা, কোন্ কবিতার অংশ এটি ? কবির বক্তব্য বিষয় বিশ্লেষণ করে লেখো।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'একটি কুঠারাঘাত/শিরে হানি অকস্মাৎ/ঘুচাইলে ভবের স্বপন।—' 'কুঠারাঘাত' বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন ? 'ভবের স্বপন' কে ঘোচালেন ? এ-কথার অর্থ কি ?

২. 'আমার রজনী শেষ,/হবে না কি, হে ভবেশ' !—'রজনী' বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন ? 'ভবেশ' কে ? কবির এই আক্ষেপের কারণ কি ?

৩. 'আমি না দেখিব কোন কালে'—কবি এ-কথা বলেছেন কেন ? কি কি দেখতে পাবেন না বলে কবি এই অংশটিতে খেদ প্রকাশ করেছেন ?

৪. 'থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে/পাব না দেখিতে নেত্রে'—কবি কেন এমন কথা বলেছেন ? সংসার-ক্ষেত্রে থেকেও তিনি কি কি দেখতে পাবেন না ?

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. অর্থ লেখো : শির, ভব, অবনী, দিনমণি, অস্তমিত, ধরা, অরণ্য, তমোময়, সৃষ্টি, অংশুমালী, সিন্ধু, ইন্দু, বিহঙ্গ, স্বপ্নবৎ, ভবলীলা, বিভু।

২. প্রত্যেকটি শব্দের অন্তত তিনটি করে সমনাম লেখো : শির, অবনী, দিনমণি, অরণ্য, অংশুমালী, বিহঙ্গ, বিভু।

৩. অর্থ বিশ্লেষণ কর : ভবের স্বপন, চির-অস্তমিত, দিনমণি, দেবতুল্য মানব-বদন, সুধার সিন্ধু, স্বপ্নবৎ, মনের কল্পনা।

৪. পদ পরিবর্তন কর : জীবন, অস্তমিত, পুলকিত, দর্শন, সংসার, চিত্র, কল্পনা।

৫. সন্ধিবিচ্ছেদ কর : কুঠারাঘাত, তমোময়, ভবেশ, সংসার।

৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ধারণ কর : কুঠারাঘাত, শোভা-ভাণ্ডার, দিনমণি, প্রতিদিন, অংশুমালী, বসন্তকাল, ভবলীলা।

৭. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ধারণ কর : ক্রন্দন, দৃষ্টি, পুলকিত, প্রভাত, জগৎ, স্মরণ।

৮. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : **অন্ধকারে** ডুবায়ে অবনী। পুলকিত করিবে **সকলে**। আকাশে দেখিব **ইন্দু**। প্রাণ নিয়ে **দুঃখে** কর পার।

পলাশীর যুদ্ধ
নবীনচন্দ্র সেন

কবি : কবিবর নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯) মধুসূদন-পরবর্তী যুগের আর এক প্রধান কবি। কবির সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল—অবকাশ-রঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস (ত্রয়ী কাব্য) প্রভৃতি। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কৃষ্ণ-চরিত-মাহাত্ম্য অবলম্বনে রচিত মহাকাব্য। কবির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল মূলত তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' ঐতিহাসিক কাব্যখানির জন্য। নবীনচন্দ্র শক্তিমান কবি ছিলেন। যথার্থ লিরিক কবির প্রতিভা ছিল তাঁর। তিনি অফুরন্ত ও অনর্গল কবিতা রচনা করতে পারতেন বলে তাঁকে বাংলার 'বায়রন' নামে অভিহিত করা হত। []

তাঁর কাব্য : কবির 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্য থেকে এই কবিতাংশটি সঙ্কলিত হয়েছে। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর হাতে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লা পরাজিত হলে স্বাধীন বাংলার গৌরব-রবি চির-অস্তমিত হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতভূমি ব্রিটিশ শক্তির শাসনাধীন হয়। এই যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং বীর শহিদ মীরমদন ও মোহনলালের আত্মোৎসর্গের কাহিনী সুবিদিত। কবি এই অংশে নবাবপক্ষের প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের নিষ্ক্রিয়তা এবং বীর মোহনলালের অপূর্ব বীরত্ব ও সংগ্রাম-কাহিনী চিত্রিত করেছেন। বীরত্বব্যঞ্জক, আবেগপূর্ণ ভাষায় দেশপ্রেমিক মোহনলালের চরিত্র ও উক্তিগুলি বাণীরূপ লাভ করায় তা অত্যন্ত আস্বাদ্য হয়েছে। এই অংশটি পাঠ করলে মনে দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনে 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য অনেক সংগ্রামীকে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্‌বোধিত ও উদ্দীপিত করেছিল। []

বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি—
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।

অর্ধ-নিষ্কোষিত অসি করি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী
নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন।

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংসোপরে;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল।

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল—
গম্ভীর গর্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ-অরি,
মুহূর্তেকে উগরিল কালান্ত-অনল।

ছুটিল একটি গোলা রক্তিম বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে
ভূতলে হইল মীর-মদন পতন।

"হর্‌রে! হর্‌রে!"—করি গর্জিল ইংরাজ!
নবাবের সৈন্যগণ
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ;
পলাতে লাগিল সবে, নাহি সহে ব্যাজ।

"দাঁড়া রে! দাঁড়া রে ফিরে! দাঁড়া এইক্ষণ
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ!
যদি ভঙ্গ দেও রণ"—
গর্জিলা মোহনলাল—"নিকট শমন!"

"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন।

"সেনাপতি! ছি ছি একি! হা ধিক তোমারে!
কেমনে বল না, হায়
কাষ্ঠের পুত্তলপ্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে?

"দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব কি দেখিছ আর?

সহে না বিলম্ব আর, চল ভ্রাতাগণ
চল সবে রণস্থলে,
দেখিব কে জিনে বলে।
দেখাব ক্ষত্রিয়-বীর্য, দেখাব কেমন!"

বাধিল তুমুল যুদ্ধ; অস্ত্রের নির্ঘাত
তোপের গর্জন ঘন,
ধূম-অগ্নি উদ্‌গিরণ,
জলধর মধ্যে যেন অশনিসম্পাত।

নাচিছে অদৃষ্ট-দেবী নির্দয়-হৃদয়
এই বৃটিশের পক্ষে,
এই বিপক্ষের পক্ষে,
এইবার ইংরাজের হ'ল পরাজয়।

অকস্মাৎ তূর্যধ্বনি হইল তখন,—
"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ।
কর অস্ত্র সম্বরণ।
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি বৃটিশ বাজনা
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা।

[সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'পলাশীর যুদ্ধ' কবিতা অবলম্বনে পলাশীর যুদ্ধের একটি চিত্র লিপিবদ্ধ কর। এই যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল অল্প কথায় লেখো।

২. বীর মোহনলালের বীরত্বপূর্ণ উক্তিগুলি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর এবং তাঁর চরিত্র আলোচনা কর।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'ইঙ্গিতে পলকে মাত্র……রণস্থল ?'—কোন্ কবির লেখা ? কোন্ কবিতার অংশ এটি ? অংশটির মূল বিষয় গুছিয়ে লেখো।

২. 'দাঁড়া রে। দাঁড়া রে ফিরে…… শমন।—কোন্ কবির লেখা ? কোন্ কবিতার অংশ এটি ? অংশটির মূল বিষয় নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৩. 'নাচিছে অদৃষ্টদেবী……পরাজয়।'—কোন্ কবির লেখা কোন কবিতার অংশ এটি ? অংশটির সহজ অর্থ বুঝিয়ে লেখো।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'ভূতলে হইল মীরমদন পতন'।—মীরমদন কে ? তাঁর কিভাবে পতন হল ?

২. 'কাঠের পুতুলপ্রায়'—কার উদ্দেশ্যে, কে এমন মন্তব্য করেছেন? কেন করেছেন?

৩. 'বাধিল তুমুল যুদ্ধ'।—কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে? এই যুদ্ধের প্রকৃতি কেমন ছিল? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. অর্থ লেখো ও বাক্যে প্রয়োগ কর: রণবাদ্য, অর্ধ-নিষ্কোষিত, অংসোপরে, কণ্টকাকীর্ণ, বজ্রনাদী, সম্মুখ-অরি, কালান্ত-অনল, ব্যাঘ্র, শমন, তুমুল, জলধর, উদ্‌গিরণ, অশনিসম্পাত, তূর্যধ্বনি, বিজয়।

২. গদ্যরূপ দাও: নিরখিল, নাশিতে, উগরিল, গর্জিলা।

৩. সন্ধি বিচ্ছেদ কর: বারেক, অংসোপরে, কণ্টকাকীর্ণ, মুহূর্তেক, কৃতান্ত, সিংহাসন, স্বাধীনতা, নির্দয়।

৪. পদ পরিবর্তন কর: ধ্বনি, নিষ্কোষিত, গম্ভীর, গর্জন, নবাব, পলায়ন, সসজ্জিত, সর্বনাশ, বিলম্ব, ক্ষত্রিয়, ক্ষান্ত সম্বরণ, ঘোষণা।

৫. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ধারণ কর: রণবাদ্য, কণ্টকাকীর্ণ, বজ্রনাদী, কালান্ত-অনল, সম্মুখ-অরি, শমন-ভবন, বঙ্গ-সিংহাসন, অশনিসম্পাত, অদৃষ্ট-দেবী, নির্দয়-হৃদয়, তূর্যধ্বনি।

৬. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর: কাঁপাইয়া **আম্রবন** উঠিল সে ধ্বনি **গর্জিলে** কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল। পলাতে লাগিল **সবে**। যায় **বঙ্গ-সিংহাসন**।

কবি / তাঁর কাব্য-কবিতা ঃ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মনীষী ও মানবপ্রেমিক। তাঁর ধর্ম ছিল মানবধর্ম। তাঁর সাধনা ছিল মহামানবতার সাধনা। তিনি বৌদ্ধজাতক, গাথা ও কাহিনী অবলম্বনে মানব-মহত্বমূলক অনেকগুলি কাহিনী-কবিতা রচনা করেছিলেন। এই কবিতাগুলিতে উদার ও মুক্ত মানবধর্মের জয়গান করা হয়েছে। কবিতাগুলি তাঁর 'কাহিনী' নামে কাব্যে সংকলিত হয়েছে। 'পূজারিণী' এমনি একটি কবিতা। মহারাজ অজাতশত্রুর ভয়ে রাজপুরীর কেউ বুদ্ধের চরণে অর্ঘ্য দিতে সাহস করল না। কিন্তু পুরপরিচারিকা শ্রীমতী সামান্যা নারী হয়েও সকলের অনুরোধ-উপরোধ ও রাজার নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করে বুদ্ধের মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধমূর্তির পদতলে প্রদীপ জ্বালিয়ে তথাগত বুদ্ধের প্রতি তাঁর ভক্তি, নিষ্ঠা ও প্রেমের এক অপূর্ব পরিচয় প্রকাশ করলেন; কিন্তু পরিবর্তে তাঁকে আহুতি দিতে হল নিজের জীবন। মহৎ লক্ষ্যে পৌছাতে হলে জীবন-মৃত্যু সব কিছুকেই তুচ্ছ করতে হয়—কবিতাটির শিক্ষা এ-ই। []

নৃপতি বিম্বিসার।

নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল
পদ-নখ-কণা তাঁর,
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ কাননে,
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ—
শিল্পশোভার সার।
সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি'
রাজবধূ রাজবালা

আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনক প্রদীপমালা।
অজাতশত্রু রাজা হ'ল যবে,
পিতার আসনে আসি',
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধ-শাস্ত্ররাশি।
কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,—
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,—
এই কটি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে।"
সে দিন শারদ দিবা অবসান,—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্য-শীতল সলিলে নাহিয়া,
পুষ্প-প্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়াল আসি'।
শিহরি' সভয়ে মহিষী কহিলা,—
"এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা—
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্য রচনা—
শূলের উপরে বসিবে সে জনা
অথবা নির্বাসনে।"

সেথা হ'তে ফিরি' গেল চলি' ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণ-মুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সিঁথির সীমার 'পরে।
শ্রীমতীরে হেরি' বাঁকি' গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত,—
কহিল,—"অবোধ, কি সাহস-বলে
এনেছিস্ পূজা, এখনি যা চলে,
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হ'লে
বিষম বিপৎপাত।"
অস্ত-রবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি' একাকিনী,
পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী,
চমকি' উঠিল শুনি' কিঙ্কিণী,
চাহিয়া দেখিল দ্বারে।
শ্রীমতীরে হেরি' পুঁথি রাখি' ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমনি ক'রে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে?"
দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্য-থালি।

"হে পুরবাসিনী"—সবে ডাকি কয়,—
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়"—
শুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।
দিবসের শেষ আলোক মিলাল,
নগর-সৌধ 'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হ'য়ে এল ক্ষীণ,
আরতি ঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজ-দেবালয়-ঘরে।
শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হ'ল সমাধান"
—দ্বারী ফুকারিয়া বলে।
এমন সময় হেরিলা চমকি'
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন, যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মত।
মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি'
শুধাল, "কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস্ আরতি ?"
মধুর কণ্ঠে শুনিল,—"শ্রীমতী,
আমি বুদ্ধের দাসী।"

সেদিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপাদমূলে নিভিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'পূজারিণী' কবিতায় পূজারিণী কে? তাঁর ওইরূপ নাম হল কেন?

২. 'পূজারিণী' কবিতাটি কোন্ কবির লেখা? কবিতাটি তাঁর কোন্ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে? কবিতাটির 'পূজারিণী' নামকরণ করা হয়েছে কেন?

৩. 'পূজারিণী' কবিতায় অজাতশত্রু, রাজমহিষী, বধূ অমিতা, শুক্লা ও পুররক্ষকের চরিত্রের কি পরিচয় ফুটে উঠেছে লেখ।

৪. 'পূজারিণী' কবিতাটির কাহিনী সংক্ষেপে গুছিয়ে লেখ। এই কবিতাটির মর্মার্থ কি?

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. এমন ক'রে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে?

—কোন্ কবির লেখা? কোন্ কবিতার অংশ? অংশটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখ।

২. 'সেদিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে...... শেষ আরতির শিখা।'—কোন্ কবিতা থেকে অংশটি নেওয়া হয়েছে? কবি কে? অংশটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখ।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. বিম্বিসার কে? তিনি কি রচনা করেছিলেন? তাঁর সেই রচনার সৌন্দর্যের পরিচয় দাও।

২ অজাতশত্রু কে ? তিনি রাজা হয়ে কি করেছিলেন এবং কি ঘোষণা করেছিলেন ?

৩. 'শ্রীমতী নামে সে দাসী'— তিনি কিভাবে, কখন, কেন মহিষীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ? মহিষী তাঁকে কি বলেছিলেন ?

৪. 'শ্রীমতীরে হেরি' বাঁকি গেল রেখা / কাঁপি গেল তার হাত'— কার কথা বলা হয়েছে ? তাঁর ওইরূপ অবস্থা হয়েছিল কেন ? তিনি শ্রীমতীকে কি বলেছিলেন ?

৫. কুমারী শুক্লা কে ? তিনি কি করছিলেন ? শ্রীমতীকে দেখে তিনি কি করলেন ? তিনি শ্রীমতীকে কি বললেন ?

৬. 'শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়, কেহ দেয় তারে গালি'।—কারা, কাকে কেন গালি দেয় ? তাদের ভয় পাবার কারণ কি ?

৭. 'আমি বুদ্ধের দাসী'—এই কথা কে, কখন, কাকে বলেছিলেন ? পরিণামে তাঁর কি হয়েছিল ?

৮. 'শেষ আরতির শিখা' কি ? তা কিভাবে নিভে গেল ?

• ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. অর্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর : পাদ-নখকণা, স্তূপ, শোণিত, অবসান, সলিল, নির্বাসন, মুকুর, চিকুর, বিপৎপাত, রশ্মি-আভা,কিঙ্কিণী, অর্ঘ্য-থালি, নগর-সৌধ, বিলীন, তিমির, অগণ্য, বিজন, পাষাণ-ফলক, প্রাসাদকানন।

২. গদ্যরূপ দাও : মাগিয়া, স্থাপিয়া, জ্বালায়ে, সঁপিল, শিহরি, ধ্বনিল, হেরিলা।

৩. বিপরীতার্থক শব্দ লেখ : নৃপতি, বিপদ, নীরব, বিষম, সাহস, সাবধান, জনহীন, বিজন, দুর্মতি, স্বচ্ছ।

৪. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : নমিয়া **বুদ্ধে** মাগিয়া লইল। রচিলা **যতনে**। ঘটিবে তাহ'লে বিষম **বিপৎপাত**। নিভিল চকিতে শেষ আরতির **শিখা**।

৫. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : স্তূপপাদমূলে, প্রদীপমালা, অজাতশত্রু, স্বর্ণ-মুকুর, সাহস-বলে, মুক্তকৃপাণে, পুররক্ষক, পাষাণ-ফলকে, প্রাসাদ-কাননে।

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কবি ঃ কবি ও নাট্যকার এবং 'হাসির গানের রাজা' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়(১৮৬৩-১৯১৩) নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এম. এ. পাস করে উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাতে যান এবং স্বদেশে ফিরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যভার গ্রহণ করেন। ইনি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, দেশপ্রেমমূলক গান ও কবিতা-রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান, সঙ্গীত-রচয়িতা, সঙ্গীতজ্ঞ এবং রঙ্গব্যঙ্গমূলক রস-রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন। এঁর বিখ্যাত নাটক নুরজাহান, শাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, মেবার পতন, দুর্গাদাস প্রভৃতি। 'হাসির গান', 'আষাঢ়ে' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এঁরই রচনা। বাংলা সাহিত্যে ও সঙ্গীত-জগতে ইনি ডি. এল. রায় নামেই অধিক পরিচিত। []

তাঁর কবিতা ঃ 'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা' রচনাটি আসলে কবিতা নয়, একটি গান। গানটি কবির বিখ্যাত নাটক 'শাজাহানে' সন্নিবেশিত। বহুলপঠিত, পরিচিত এই দেশপ্রেমমূলক গানটিতে আমাদের স্বদেশের এক অপরূপ চিত্র ও চরিত্র ধরা পড়েছে। এই গানটির সঙ্গে পরিচয় নেই এমন বাঙালি বোধহয় কেউ নেই। []

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ;
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক' তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

চন্দ্রসুর্য গ্রহ তারা কোথায় এমন উজল ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে !
সেথা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে !

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক' তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক' তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক' তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ?
ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক' তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' সঙ্গীতটি কবির কোন্ গ্রন্থে আছে? কবি দেশজননীকে 'সকল দেশের রানী' বলেছেন কেন বুঝিয়ে লেখো।

২. 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' সঙ্গীতটি অবলম্বন করে আমাদের দেশজননীর সৌন্দর্য, মমত্ব ও মাধুর্যের পরিচয় দাও। এই রচনায় কি সত্যিসত্যিই ভারতবর্ষের চিত্র ফুটে উঠেছে?

● **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী**

১. 'চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা.....জেগে'।—ছত্রগুলি কোন্ কবিতার, অন্তর্গত? কবি কে? অংশটির অর্থ বুঝিয়ে লেখো।

২. 'পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ..... ধেয়ে'—অংশটি কোন্ কবির লেখা কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে? অংশটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখো।

৩. 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ····· মরি।'—কোন্ কবিতা থেকে অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে? কবির নাম কি? অংশটির মধ্যে আমাদের দেশবাসীর সম্পর্কের কি পরিচয় ফুটে উঠেছে?

● **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী**

১. আমাদের দেশ কেমন? আমাদের দেশে কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়?

২. 'সেথা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে।'—কোথায়? আমরা কিভাবে ঘুমোই এবং কিভাবে জাগি?

৩. আমাদের দেশের নদী, পাহাড়, ক্ষেত্র, আকাশ, বাতাস কেমন? তাদের সৌন্দর্য বর্ণনা কর।

৪. 'তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে'—তারা কারা? কিভাবে তারা ঘুমিয়ে পড়ে?

৫. কবিতাটির শেষ স্তবকে কবি দেশজননীর কাছে কি প্রার্থনা জানিয়েছেন? এরকম বাসনা আর কোন কবি কবিতায় প্রকাশ করেছেন বলতে পারো?

● **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. শব্দগুলির অর্থ লেখো ও বাক্যে প্রয়োগ কর: বসুন্ধরা, তড়িৎ, উজল, ধূম্র, হরিৎ, শাখী।

২. গদ্যরূপ দাও: উজল, গুঞ্জরিয়া।

৩. অন্তত তিনটি করে সমার্থক শব্দ লেখো: বসুন্ধরা, দেশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, তড়িৎ, নদী, পাহাড়, হরিৎ, আকাশ, শাখী, ফুল।

বল বল বল সবে • অতুলপ্রসাদ সেন •

কবি : কবি ও সঙ্গীত-রচয়িতা অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১—১৯৩৪) লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী ব্যারিস্টার ছিলেন। সুখ্যাত গীতিকার ও সুরকার হিসাবেই এঁর খ্যাতি। বাংলা ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বিষয় ও সুর-সমৃদ্ধ সঙ্গীত লিখে ইনি যশস্বী হন। অতুলপ্রসাদের গানের সঙ্কলনের নাম 'কয়েকটি গান'—এরই পরিবর্ধিত সংস্করণ 'গীতিগুঞ্জ'। []

তাঁর কবিতা : বাংলা সঙ্গীত-রচনায় রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী অতুলপ্রসাদ। তিনিই বাংলা গানে লক্ষ্ণৌ-ঘরানার গজল ঠুংরি ও টপ্পার প্রচলন করেন। এঁর রচিত গানগুলি কথায় ও সুরে মর্মস্পর্শী। ইনি বেশকিছু দেশপ্রেমমূলক বা জাতীয় সঙ্গীতও রচনা করেন। 'বল বল বল সবে' সেগুলিরই অন্যতম। এই সঙ্গীতটির মধ্য দিয়ে আমাদের ভারতীয় সভ্যতা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি চিত্তগ্রাহী ছবি ফুটে উঠেছে। []

বল, বল, বল সবে, শত বীণা বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে!
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিনদিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী, এখনও অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন, কহিছে গৌরব-কাহিনী।
বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী,
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি, আমরা তাদেরই সন্ততি॥

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
নানক, নিমাই করেছিল ভাই, সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান,
ত্রিশকোটি দেহ হবে এক প্রাণ, একজাতি প্রেম-বন্ধনে॥
মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে,
দু'দিনের তরে হীনতা সহিছে, জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য, আসিবে আবার আসিবে॥
এস হে কৃষক কুটির-নিবাসী,
এস অনার্য গিরি-বনবাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,—মিল হে মায়ের চরণে।
এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,
পরহিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,—মিল হে মায়ের চরণে।
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ খৃষ্টীয়ান,—মিল হে মায়ের চরণে॥

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'—কবি এই পংক্তিটির মাধ্যমে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, তা নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখো।

২ 'বল বল বল সবে' কবিতাটিতে কবি ভারতবর্ষের যে গরিমাময় রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে লেখো।

৩. কবি ভারতবর্ষকে যে ভাব-রূপে দেখতে চান, তা কিরূপ ? ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার জন্য কবি কাদের আহ্বান করেছেন ? তাঁরা কি কাজ করলে কবির আশা সফল হবে ?

● **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী**

১. 'নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।'—কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ ? অংশটির বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

২. 'ভুলি-ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান ... পিছে'—কবি কে ? তাঁর কবিতার নাম কি ? এই অংশে তাঁর বক্তব্য কি ?

৩. 'এস হে কৃষক কুটির-নিবাসী... .. চরণে'।—কবি কে ? তাঁর কোন্ কবিতা থেকে এই অংশটি নেওয়া হয়েছে ? অংশটির তাৎপর্য কি ?

● **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী**

১. মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী—এঁরা কে ? কবি কি জন্য এঁদের কথা স্মরণ করেছেন ?

২. 'ভোলেনি ভারত'—ভারত কি ভোলেনি ? নানক, নিমাই কে ? তাঁরা কি করেছিলেন ?

৩. কবি কবিতাটির শেষে কাদের আহ্বান করছেন ? কেন আহ্বান করেছেন ?

● **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. শব্দার্থ লেখো ও বাক্যে প্রয়োগ কর : বেণু-রব, দিনমণি, অমৃতবাহিনী, প্রান্তর, গুহা, অগণন, জনপদ, বীরেন্দ্র-প্রসূতি, লহরী, সন্ততি, ভারত-নন্দন, পরহিত-ব্রত, দীক্ষিত।

২. গদ্যরূপ দাও : লবে, উদিবে, কহিছে, হেথা, তরে, পূরব, মিলহে।

৩. পদ পরিবর্তন কর : ভারত, জগৎ গঙ্গা, জনপদ, প্রসূতি, হীনতা, শিক্ষিত।

৪. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : শ্রেষ্ঠ, পুরাতন, পূরব, অহিংসা, সংসারী।

৫. সন্ধিবিচ্ছেদ কর : বীরেন্দ্র, অহিংসা, সন্ন্যাসী, সংসারী।

৬. সন্ধি কর : জাতি-অভিমান।

৭ স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর : বল, বল, বল **সবে**। ভোলেনি **ভারত**। এক জাতি **প্রেম-বন্ধনে**।

৮. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : দিনমণি, গিরিরাজ, অমৃতবাহিনী, অগণন, ভারত-নন্দনে, কুটির-নিবাসী, অনাথ, পরহিত-ব্রত।

মেথর
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি : রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রধান কবিগণের অন্যতম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২ – ১৯২২ খ্রী:)। মনীষী সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার চুপীগ্রাম। কিশোর বয়স থেকেই কবিতা রচনা করেন সত্যেন্দ্রনাথ। পরিণত বয়সে নানারকম ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অতিশয় যশস্বী হন এবং 'ছন্দের যাদুকর' আখ্যায় ভূষিত হন। দেশ-বিদেশের বহু কবিতা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেও অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাদি—কুহু ও কেকা, বেণু ও বীণা, হোমশিখা, অভ্র-আবীর, তীর্থরেণু, তীর্থসলিল প্রভৃতি। []

তাঁর কবিতা : সত্যেন্দ্রনাথের প্রধান খ্যাতি ছান্দসিক হিসাবে। কিন্তু মানবতাবাদী কবি হিসাবেও তিনি অগ্রগণ্য। পরবর্তীকালে নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ কবিগণ তাঁর পদাঙ্কই অনুসরণ করেন। মহাত্মা গান্ধীর 'অস্পৃশ্যতা আন্দোলনে'র শরিক হয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো সত্যেন্দ্রনাথ জাতপাত, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অনেক কবিতা লেখেন। 'মেথর' সেই কবিতাগুলিরই একটি। এই কবিতায় মেথরের বৃত্তি ও সমাজসেবার প্রতি কবির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রশংসার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। []

কে বলে, তোমারে বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে।
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।
শিশু জ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রি দিন সর্ব ক্লেদ গ্লানি।

ঘৃণার নাহিক' কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী ।
নির্বিচারে আবর্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল ।
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ ;
আর তুমি ? তুমি তারে করেছ নির্মল ।
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে—
কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে ।

অনুশীলনী

• বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. মেথর আমাদের সমাজ-সংসারের যত আবর্জনা ও ময়লা পরিষ্কার করে বলে তাকে 'অস্পৃশ্য বা অশুচি' বলা কি ঠিক ? 'মেথর' কবিতাটি অবলম্বন করে তোমার উত্তরটি লেখো ।

২. 'মেথরকে' কবি কি কি বলে সম্ভাষণ করেছেন ? মেথর 'সমাজ-বন্ধু' কেন ? মেথরকে হেয় করা কি উচিত ?

• ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি ... বনে ।'—কোন্ কবির লেখা কোন্ কবিতা থেকে আলোচ্য অংশটি নেওয়া হয়েছে ? কবিতাটির সরল অর্থ কি ?

২. 'শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে... বাণী ।'—কোন্ কবির লেখা কোন্ কবিতার অংশ এটি ? কবির বক্তব্য গুছিয়ে লেখো ।

• সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. মেথর সমাজের কি মঙ্গল করে ? কিন্তু আমরা তাদের কি দৃষ্টিতে দেখি ? মেথরকে কি চোখে দেখা উচিত ?

২. 'নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ/আর তুমি ? তুমি তারে করেছ নির্মল ।'—নীলকণ্ঠ কে ? তিনি কিভাবে পৃথিবীকে নির্বিষ করেছিলেন ? মেথরের কাজ তাঁর কাজের সঙ্গে তুলনীয় কেন ?

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. শব্দার্থ লেখো ও বাক্যে প্রয়োগ কর : অস্পৃশ্য, অশুচি, গৃহবাসে, রুচি, শিশুজ্ঞানে, নির্বিকার, পৃথ্বী, নির্বিষ, লাঞ্ছনা।

২. পদ পরিবর্তন কর : অস্পৃশ্য, অশুচি, বন, শিশু, ক্লেদ, নির্মল, লাঞ্ছনা, কল্যাণ, শক্তি।

৩. সন্ধি বিচ্ছেদ কর : নির্বিচার, নির্বিকার, নির্মল, অহর্নিশ।

৪. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর : অস্পৃশ্য, শুচিতা, মানব, কর্ম।

৫. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : গৃহবাসে, নির্বিচারে, অহর্নিশ, নির্বিকার, নীলকণ্ঠ, নির্বিষ, নির্মল।

৬. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : **শুচিতা** ফিরিছে সদা। **শিশুজ্ঞানে** সেবা তুমি করিতেছ। ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের **মানবে**।

চোর-ডাকাত

• নজরুল ইসলাম

কবি : বাংলার চিরতরুণ 'বিদ্রোহী কবি' কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬)। জন্মস্থান : বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রাম। বাংলা কবিতায় তিনি এনেছিলেন তীব্র আবেগ এবং যৌবনদীপ্তি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙালি পল্টনে সৈনিকরূপে যোগদান করেন। পরে কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস করার সময় কবিতা ও গান লিখে প্রভূত যশ অর্জন করেন, প্রথম যৌবনের 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার জন্য 'বিদ্রোহী কবি' রূপেই আমৃত্যু আখ্যাত হয়ে থাকেন। নজরুল সঙ্গীত-রচয়িতা ও সুরকার হিসাবেও অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। 'নজরুল-গীতি' এখন একটি বিশেষ সঙ্গীতধারা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। কবির রচিত গ্রন্থাদি—অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, সর্বহারা প্রভৃতি। []

তাঁর কবিতা : নজরুল ছিলেন বিপ্লব ও বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবি। সমাজে, জীবনে—যেখানেই অসাম্য, অন্যায়, অত্যাচার, সেখানেই তিনি প্রতিবাদী, কঠোর সমালোচক, ভর্ৎসনা নিন্দা ও অভিশাপ-উচ্চারণে সোচ্চার। আলোচ্য 'চোর-ডাকাত' কবিতাটিতেও কবির মুখর প্রতিবাদ, সমালোচনা ও ভর্ৎসনা ধ্বনিত হয়েছে ছত্রে ছত্রে—ধনিক শ্রেণী, সমাজনায়ক ও ভণ্ড বিচারকদের প্রতি। সাধারণভাবে আমরা চোর-ডাকাতকে যে চোখে দেখি তা না করে কবি তাদের গভীর মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। এইজন্যই কবিতাটির বিষয়বস্তু অভিনব। []

তোমায় কে বলে ডাকাত, বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে ?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরই রাজ্য চলে।
চোর ডাকাতের করিছে বিচার কোন্ সে ধর্মরাজ ?
জিজ্ঞাসা কর, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ ?

বিচারক ! তব ধর্মদণ্ড ধর,
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড় !
যারা যত বড় ডাকাত দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ ।
রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত ইঁটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে ।
দিব্যি পেতেছে খল কল-ওয়ালা—মানুষ-পেষানো কল,
আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল ।
কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়িয়া কল-ওয়ালা,
ভরিছে তাহার মদিরা-পাত্র, পুরিছে স্বর্ণ-জালা ।
বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফুলে মহাজন-ভুঁড়ি,
নিরন্নদের ভিটে নাশ করে জমিদার চড়ে জুড়ি !
অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল কিছু,
দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু ।
পালাবার পথ নাই
দিকে দিকে আজ অর্থ-পিশাচ খুঁড়িয়াছে গড়খাই ।
জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাত—
চোরে চোরে এরা মাসতুতো ভাই, ঠগে ও ঠগে শ্যাঙাৎ ।
কে বলে তোমায় ডাকাত বন্ধু, কে বলে করিছ চুরি ?
চুরি করিয়াছ টাকা, ঘটি, বাটি, হৃদয়ে হাননি ছুরি !
ইহাদের মত অমানুষ নহ, হতে পার তস্কর,
মানুষ দেখিলে বাল্মীকি হও তোমরা রত্নাকর !

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'চোর-ডাকাত' কবিতার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে চোর-ডাকাতের প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধের কারণ বিবৃত কর। কবিকে সমর্থন করে কি একথা

বলা যায় যে, চুরি-ডাকাতির জন্য চোর-ডাকাতকে শাস্তি বা দণ্ড দেওয়া অনুচিত?

২. 'জিজ্ঞাসা কর, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ?'—কবি কাদের 'দস্যু' বলে আখ্যাত করছেন? তাদের ওইরকম বলার কারণ কি?

● **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী**

১. 'বিচারক! তব ধর্মদণ্ড ধর ...... আজ।'—কোন্ কবির লেখা? কোন্ কবিতার অংশ এটি? কবির বক্তব্য বিষয়টি বুঝিয়ে লেখো।

২. 'জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা......শ্যাঙাৎ।'—কোন্ কবির লেখা কোন্ কবিতা থেকে অংশটি নেওয়া হয়েছে? অংশটির বিষয়-তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখো।

৩. 'ইহাদের মত অমানুষ নহ ... রত্নাকর।'—কবিতার নাম কি? কবি কে? এই অংশে কবির বক্তব্য কি?

● **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী**

১. 'চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরই রাজ্য চলে।'—'ডঙ্কা' কি? এই অংশে কবির বক্তব্য কি?

২. 'কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়িয়া' কল-ওয়ালা...স্বর্ণ-জালা'—কল-ওয়ালা কারা? তারা কিভাবে স্বর্ণ-জালা এবং মদিরা-পাত্র ভরে?

৩. মহাজন ও জমিদার কিভাবে স্ফীত হয়? কাদের সর্বনাশ করে কিভাবে তারা ধন অর্জন করে?

৪. 'জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাত'—'জিন্দানখানা' কি? উদ্ধৃত অংশটির অর্থ কি?

৫. 'ইহাদের মত অমানুষ নহ'—কাদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেছেন কবি? 'ইহাদের' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন? 'অমানুষ' বলার কারণ কি?

৬. 'মানুষ দেখিলে বাল্মীকি হও তোমরা রত্নাকর।'—এখানে 'মানুষ' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? রত্নাকর কিভাবে বাল্মীকি হন? এই তুলনাটির দ্বারা কবি কি বলতে চেয়েছেন?

● **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. শব্দগুলির অর্থ শেখো এবং বাক্যে প্রয়োগ কর: ডঙ্কা, ধর্মরাজ, দস্যু ধর্মদণ্ড, জাতি-সঙ্ঘ, মানুষ-পেষানো কল, ভুখারী, বিপন্ন, নিরন্ন, অর্থ-পিশাচ, গড়খাই, জিন্দানখানা, শ্যাঙাৎ।

২. পদ পরিবর্তন কর: ডাকাত, চোর, দস্যু, জোচ্চোর, দাগাবোজ, মনুষ্যত্ব, বন্ধু, তস্কর।

৩ সন্ধি বিচ্ছেদ কর: নিরন্ন, তস্কর, রত্নাকর।

৪ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: ধর্মরাজ, ধর্মদণ্ড, স্বর্ণ-জালা, অমানুষ, নিরন্ন, রত্নাকর।

৫. প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর: দাগাবাজ, ভুখারী, বিপন্ন, জমিদার, দেউলিয়া, জিন্দানখানা, প্রহরী।

৬ স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর: রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত **ইঁটে**। দিকে দিকে আজ অর্থ পিশাচ খুঁড়িয়াছে **গড়খাই**। ইহাদের মত **অমানুষ** নহ।

কবি ঃ কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩—১৯৭০) রবীন্দ্র-প্রভাবিত এবং রবীন্দ্রযুগ ও রবীন্দ্র-পরবর্তীকালের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। কালিদাস রায়ের মত ইনিও আজীবন শিক্ষকতাবৃত্তি অবলম্বন করে গ্রামেই অবস্থান করেছিলেন। পল্লীগ্রাম ও পল্লীজীবনের অপরূপ ভাষ্যকার কুমুদরঞ্জন। সহজ সরল জীবন, চারিপাশের প্রকৃতি ও মানুষ তাঁর অধিকাংশ কবিতার বিষয়। কখনো কখনো ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, কিংবদন্তী অবলম্বন করেও কবিতা রচনা করেছিলেন। এঁর ভাষার প্রাঞ্জলতা, ছন্দের সারল্য ও বাক্যের নিরলংকরতা পাঠককে ভীষণভাবে মুগ্ধ করে। কবির কাব্যগ্রন্থ—বনতুলসী, শতদল, একতারা, নূপুর, উজানী, বনমল্লিকা, রজনীগন্ধা, অজয় প্রভৃতি। []

তাঁর কবিতা ঃ কবি কুমুদরঞ্জন স্বদেশের ইতিহাস, পুরাণ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। মূলত পল্লীজীবন ও পল্লীপ্রকৃতি এবং বৈষ্ণব-ভক্তিবাদ তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য হলেও, দেশের পুরাণ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তীকে আশ্রয় করেও তিনি অনেকগুলি মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেছিলেন। 'কৃষ্ণারজনী' কবিতায় কবি পুরাণ, ইতিহাস থেকে কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনা উদ্ধার করে এক আশ্চর্য বাণীরূপ দান করেছেন। []

বুঝি সেদিন সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার,
এমনি প্রখর-ঝটিকা মুখর চারিধার।
সতী-সাবিত্রী মৃত পতি কোলে
একাকিনী ভাসে নয়নের জলে,
শিয়রে শমন কত কথা বলে
দমকে দামিনী বারেবার।
বুঝি সেদিনো সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার।

বুঝি সেদিনো এমনি গুরুগর্জন অবিরল,
মত্ত পবনে বরুণ রাজ্য টলমল।

গাঙুরের নীরে ভাসাইয়া ভেলা,
মৃত পতি দেহ আবরি' বেহুলা,
চলে অসহায়া একাকিনী বালা
ঝরে নিশিদিন আঁখিজল,
বুঝি সেদিনো এমনি গুরুগর্জন অবিরল।

বুঝি সেদিনো এমনি ধাঁধায় বিজলি দু'নয়ন,
আঁধার নিশার আঁধার বাড়ায়ে অনুখন।
বারাণসীধামে গঙ্গার তীরে
ধূলিলুণ্ঠিতা শৈব্যার ক্রোড়ে,
চণ্ডালবেশী নৃপতি নেহারে
মৃত পুত্রের সে বদন,
বুঝি সেদিনো এমনি ঝলকে বিজলি খনে খন।

বুঝি সেদিনো এমনি জলের কাতর কলকল,
বনমর্মরে ত্রস্ত চকিত মৃগদল।
দময়ন্তীরে ফেলি বন মাঝ
কোথা পলাইয়া গেল নলরাজ,
কাঁদে রাজবধূ একাকিনী আজ
মলিন বদন শতদল,
বুঝি সেদিনো এমনি জলের কাতর কলকল।

তব সনে মিশি আছে নিশি কত হাহাকার,
কত শ্মশানের অঙ্গার কত আঁখিধার।
শোকের কালিমা যুগ যুগ ধরি'
তোমার আঁধার দিয়াছে যে গড়ি'
কত সুষমার কত চিতা মরি
নিভেছে জ্বলেছে অনিবার।
তব সনে মিশি আছে কত নিশি হাহাকার।

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'কৃষ্ণারজনী' কবিতায় কবি 'কৃষ্ণারজনী' বলতে কি বুঝিয়েছেন? কবিতাটির নামকরণ কতখানি সঙ্গত হয়েছে, বিচার কর।

২. 'কৃষ্ণারজনী' কবিতায় কবি যে চারটি পৌরাণিক কাহিনীর প্রসঙ্গ এনেছেন, সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'শিয়রে শমন কত কথা বলে......বারে বার।'—কোন্ কবির লেখা কোন্ কবিতার অন্তর্গত? অংশটির বিষয় গুছিয়ে লেখো।

২. 'তব সনে মিশি আছে কত নিশি...হাহাকার।'—কোন্ কবির লেখা? কবিতার নাম কি? অংশটির অর্থ-তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখা।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'সতী-সাবিত্রী মৃতপতি কোলে'—সতী সাবিত্রী কে? তিনি মৃত পতি কোলে নিয়ে নয়নের জলে ভাসছিলেন কেন?

২. বেহুলা কে? তিনি গাঙুরের জলে ভেলা ভাসিয়েছিলেন কেন?

৩. 'বারাণসী ধামে গঙ্গার তীরে / ধূলিলুণ্ঠিতা শৈব্যার ক্রোড়ে'—বারাণসী ধামে গঙ্গাতীরে শৈব্যা ধূলিলুণ্ঠিতা হয়েছিলেন কেন? শৈব্যা কে? তাঁর ক্রোড়ে কে ছিল?

৪. 'দময়ন্তীরে ফেলি বন মাঝ'—দময়ন্তী কে? কে তাকে বনের মধ্যে ফেলে গিয়েছিলেন? কেন?

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. শব্দার্থ লেখো ও বাক্যে প্রয়োগ কর: ঝটিকা, শমন, দামিনী, নীর, অবিরল, বিজলি, ধূলি, শতদল, লুণ্ঠিতা, বনমর্মর, মৃগদল, বদন, অঙ্গার, অনিবার।

২. গদ্যরূপ দাও: আঁধিয়ার, দমকে, আবরি, অনুখন, নেহারে।

৩. পদ পরিবর্তন কর: মৃত, লুণ্ঠিতা, কাতর, মুখর, মলিন।

৪. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : রজনী, প্রখর, মুখর, মৃত, ত্রস্ত, মলিন, কাতর।

৫. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : একাকিনী ভাসে নয়নের **জলে**। **বনমর্মরে** ত্রস্ত চকিত মৃগদল। চণ্ডালবেশী নৃপতি নেহারে মৃত পুত্রের সে **বদন**।

৫. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর : শমন, গর্জন, পবন, ত্রস্ত, শ্মশান, মলিন।

৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : গুরুগর্জন, নিশিদিন, ধূলিলুণ্ঠিতা, বনমর্মরে, শতদল, রাজবধূ।

কবি ঃ কবিশেখর কালিদাস রায় (১৮৮৯—১৯৭৫) রবীন্দ্র-সমসাময়িক এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের একজন প্রভাবশালী ও শক্তিমান কবি। কবির জন্মভূমি ঃ বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রাম। কবি আজীবন শিক্ষকবৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিগণের মধ্যে কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইনি কবিতায় গ্রামবাংলার অপূর্ব ছবি আঁকতেন। বৈষ্ণব-ভাবনা এঁর কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট। এসব দিক থেকে কুমুদরঞ্জন এঁর সমধর্মী। কবির রচিত কাব্যগ্রন্থ—কিশলয়, পর্ণপুট, হৈমন্তী, বল্লরী, ঋতুমঙ্গল, গাথামঞ্জরী ইত্যাদি।

তাঁর কবিতা ঃ কালিদাস রায় সংস্কৃতিপ্রিয়, ঐতিহ্যমুখী এবং সহজ-সরল জীবনের কবি-ভাষ্যকার। সহজ-সাবলীল ভঙ্গী, ছন্দ ও বর্ণনাগুণে তাঁর কবিতা অনন্ত। মানুষের জীবনের মহত্ত্ব, মানবিক সংবেদনা, আদর্শ, নিখিল বিশ্বজীবে প্রীতি ও শ্রদ্ধা তাঁর বহু কবিতার বিষয়ীভূত। কাহিনীমূলক অনেক কবিতায় তিনি জীবনের সত্যরূপ ও উপলব্ধির হৃদয়স্পর্শী চিত্র এঁকেছেন। 'যত্র জীব তত্র শিব'—এই মহৎ জীবনদৃষ্টি 'তীর্থফল' কবিতাটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। []

গঙ্গার জলে প্রয়াগে কুম্ভ ভরি'
সাধু চলেছেন দক্ষিণাপথে দক্ষিণ পথ ধরি'।
রামেশ্বরের গায়
গঙ্গার জল ঢালিবেন বলি' চলেন এ ভরসায়।
পড়িল সে পথে সুবিশাল প্রান্তর,
সেই প্রান্তরে দেখিলেন সাধুবর—
গর্দভ এক করে ছটফট, বালুতে পড়িয়া আছে,
দেখিয়া তা সাধু গেলেন তাহার কাছে।

পড়েছে নয়নে তার মরণের ছায়া,
তারে হেরি হ'ল মায়া,
অঙ্গে তাহার বুলালেন করতল
অঞ্জলি ভরি মুখে তার সাধু দিলেন গঙ্গাজল।
মুখ বিস্ফারি' আরো জল পশু চায়,
কলসী উজাড়ি' সমস্ত বারি ঢালিয়া দিলেন তায়।
সুস্থ হইয়া তৃষিত পশুটি জীবন পাইল ফিরে,
কান ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াল ধীরে।
কহিল শিষ্য—"এত দূর প্রভু এসে
তীর্থযাত্রা বিফল করিলে শেষে?"
কহিলেন সাধু—"দেখ ভাই মোর প্রভুর করুণা কত,
আমারে জানিয়া ক্লান্তকাতর কলসীর ভারে নত,
আগায়ে এলেন, নিলেন আমার দান,
দীর্ঘ পথের ঘটালেন অবসান।
জীবের মাঝারে শিবের বাস যে, পাপী সেই ভুলে যেবা,
জীবের সেবাই তাই ত শিবের সেবা।"

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'তীর্থফল' কবিতাটির কাহিনী সংক্ষেপ বর্ণনা করে 'তীর্থফল' নামকরণের যাথার্থ্য বিচার কর।

২. সাধু কি উদ্দেশ্যে কোথায়, কি নিয়ে যাত্রা করেছিলেন? পথে তিনি কি দেখতে পেলেন? তারপর তিনি কি করলেন? কেন করলেন?

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'জীবের মাঝারে শিবের যে বাস .....শিবের সেবা।'—কোন্ কবির লেখা? কোন্ কবিতার অংশ? অংশটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'এত দূরে এসে/তীর্থযাত্রা বিফল করিলে শেষে?'—কার প্রতি কার উক্তি? বক্তার এরূপ কথা বলবার কারণ কি?

২. 'দেখ ভাই মোর প্রভুর করুণা কত?—কে, কাকে এই কথা বলেছিলেন? 'প্রভুর করুণা' কি? তিনি 'প্রভুর করুণা' বলতে কি বুঝেছিলেন?

৩. 'জীবের সেবাই তাইত শিবের সেবা।'—বক্তা কে, শ্রোতা কে? কথাগুলির মর্মার্থ লেখ।

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. শব্দগুলির গদ্যরূপ দাও: বিস্ফারি, উজাড়ি, আগায়ে, গায়, মাঝারে, যেবা।

২. পদ পরিবর্তন কর: সাধু, জল, পশু, জীবন, বিফল, তৃষিত, অবসান, করুণা, দীর্ঘ, দান।

৩. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: ক্লান্তকাতর, গঙ্গাজল, করতল, তীর্থযাত্রা।

৪. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর: গঙ্গার **জলে** প্রয়াগে কুম্ভ ভরি'। **গর্দভ** এক করে ছটফট। পশুটি **জীবন** পাইল ফিরে।

৫. বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: সুবিশাল, সাধু, তৃষিত, বিফল, নত, অবসান, পাপী।

হারানো টুপি

কাজী কাদের নওয়াজ

কবি : কাজী কাদের নওয়াজ (১৯০২—) মুসলমান কবিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। কবি কাদের নওয়াজ তুচ্ছ. সাধারণ বা সামান্য বিষয় নিয়েও সুন্দর সরস কবিতা রচনা করে থাকেন। 'হারানো টুপি' কবিতাটি তার সুন্দর উদাহরণ। []

তাঁর কবিতা : লঘু বিষয় অবলম্বন করে কতো তরতাজা কৌতুককর কবিতা লেখা যায়, 'হারানো টুপি' পড়লেই তা বোঝা যায়। একটি সামান্য টুপি-হারানোর ঘটনাকে অবলম্বন করে কবি চমৎকার এই হাস্যরসাত্মক কবিতাটি লিখেছেন। []

টুপি আমার হারিয়ে গেছে—
হারিয়ে গেছে ভাই রে,
বিহনে তার এই জীবনে
কতই ব্যথা পাই রে।

হাসবে লোকে শুনলে পরে
হারাল সে কেমন করে,
কেমন করে বৈশাখী ঝড়
উড়িয়ে দিল মোর সে টুপি
বুঝেছি হায় টুপির লোভে
দেবতাদেরই এ কারচুপি।

থাকত টুপি দুপুর রোদে
ছায়ার মতই মাথায় মম,
কখনো বা বাতাস খেতাম
ঘুরিয়ে তারে পাখার সম !
বক্ষে তাহার নিতুই প্রাতে
ফুল রেখেছি আপন হাতে,
সে ছিল মোর ফুলদানি আর
ফুলের সাজি এক সাথে হায়,
জানিনে আজ কোথায় গেছে
কোন দেশে সে কোন অলকায় ।

হয়ত এখন পবনদেবের
মাথায় আছে সেই টুপি মোর,
এদিকে তার বিচ্ছেদে হায়
আমার চোখে ঝরতেছে লোর !
ভুলতে নারি টুপির প্রীতি,
জাগছে হৃদে শুধুই স্মৃতি—
বিদেশ গেলে বালিশ হত
হায় সে টুপি মোর শিয়রে,
চলতে পথে সেলাম পেতাম
থাকলে টুপি মাথার ’পরে !
তিনটি টাকায় কিনেছিলাম
চাঁদনি হতে সেই টুপিরে,
তিনশো টাকা দিবই আজি
পাই যদি ফের তারেই ফিরে ।
চার মিনিটে ‘চসার’ পড়ে
শেষ করেছি টুপির জোরে,—

পরীক্ষাতে প্রথম হতাম
থাকলে টুপি মাথার 'পরে ;
দুখের দিনের বন্ধু টুপি
কোথায় গেলি আজকে, ওরে।

আজিও হায় নিমন্ত্রণে
গেলে সভার মধ্যখানে,
সব ভুলে যে প্রথম আমি
তাকাই লোকের মাথার পানে।
দেখি কেবল চুপি চুপি
কার শিরে রয় আমার টুপি,
মিলে না খোঁজ, সভার থেকে
ফিরে আসি শুষ্কমুখে ;
নূতন টুপি কিনব না ভাই,
পণ করেছি মনের দুখে।

অনুশীলনী

● **বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী**

১. কবি টুপিটি কিভাবে হারিয়েছিলেন? টুপিটি তাঁর কি কি কাজে লাগত? কবি কিছুতেই টুপির শোক ভুলতে পারছেন না কেন?

২. 'হারানো টুপি' কবিতাটি অবলম্বন করে কবির হাস্যরসিকের মেজাজটির পরিচয় দাও। লঘু স্বরের কবিতা হিসাবে এটি কেমন লাগে?

● **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী**

১. 'বুঝেছি হায় টুপির লোভে দেবতাদেরই এ কারচুপি।'—কোন্ কবির লেখা কোন্ কবিতা থেকে অংশটি নেওয়া হয়েছে? অংশটির বক্তব্যবিষয় বুঝিয়ে লেখো।

২. 'ভুলতে পারি টুপির প্রীতি,/জাগছে হৃদে শুধুই স্মৃতি'—কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ এটি? অংশটিতে কবি কি বলতে চেয়েছেন?

৩. 'নতুন টুপি কিনব না, ভাই, পণ করেছি মনের দুখে।'— কোন্ কবির লেখা কোন্ কবিতা থেকে ছত্রদুটি নেওয়া হয়েছে? এখানে কবির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা গুছিয়ে লেখো।

● **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী**

১. কবির টুপিটি কাদের কারচুপিতে বৈশাখী ঝড় উড়িয়ে নিয়েছিল? এখন সেটা কোথায় আছে বলে কবির ধারণা?

২. বিদেশে গেলে টুপিটি কবির কি কাজে লাগত? কত টাকায় তিনি সেটা কিনেছিলেন? ফিরে পেলে তিনি কত টাকা দিতে রাজী?

৩. টুপিটি মাথায় থাকলে কবির পরীক্ষায় কি রকম ফল হত? নিমন্ত্রণে গেলে তিনি টুপির খোঁজ করেন কিভাবে?

● **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. শব্দার্থ লেখো ও বাক্যে প্রয়োগ কর: বিহনে, কারচুপি, হেলা, অলকা, পবনদেব, শিয়র, চসার, শির, শুষ্কমুখে।

২. পদ পরিবর্তন কর: ব্যথা, বৈশাখী, ঝড়, বিচ্ছেদ, বিদেশ, সেলাম, নিমন্ত্রণ।

৩. সন্ধি বিচ্ছেদ কর: পবন, বিচ্ছেদ, পরীক্ষা।

৪. প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর: বৈশাখী, বিচ্ছেদ, পরীক্ষা, নিমন্ত্রণ।

৫. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো: ব্যথা, লোভ, বিচ্ছেদ, প্রীতি, প্রথম, নতুন।

৬. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর: হাসবে **লোকে** শুনলে পরে। এদিকে তার **বিচ্ছেদে** হায় আমার **চোখে** ঝরতেছে লোর।

এখানে আকাশ নীল

জীবনানন্দ দাস

কবি : আধুনিক কালের বাংলা কাব্যসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাস (১৮৯৮—১৯৫৪)। কবির জন্মস্থান অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। কবির জননী কুসুমকুমারীও কবি হিসাবে সুখ্যাত হয়েছিলেন। জীবনানন্দের বৃত্তি ছিল অধ্যাপনা। তাঁর কবিতার ভাষা, উপমা, প্রকাশভঙ্গি সবই নতুন ও চিত্রগীতিময়। কবিতার বিষয়বস্তু ইতিহাস, স্বদেশ ও সংস্কৃতি, সমসাময়িক দেশ-কাল ও মানুষ এবং বাংলার পল্লীপ্রকৃতি। জীবনানন্দকে 'নির্জনতম' কবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রচিত গ্রন্থ—রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, ধূসর পাণ্ডুলিপি, সাতটি তারার তিমির, মহাপৃথিবী ইত্যাদি। []

তাঁর কবিতা : কবি জীবনানন্দ দাস বাংলার—বিশেষত পূর্ববাংলার প্রকৃতি, মানুষ, লোককথা, কিংবদন্তী প্রভৃতি অবলম্বন করে এক আশ্চর্য কাব্য রচনা করেছেন, যার নাম 'রূপসী বাংলা'। 'এখানে আকাশ নীল' এই কবিতাটি 'রূপসী বাংলা' থেকে সঙ্কলিত। এই কবিতায় কবি বাংলার পরিচিত প্রকৃতি, নদী, পাখি, ফল,—ধনপতি, শ্রীমন্ত, বেহুলা, মুকুন্দরাম, চণ্ডিকামঙ্গল প্রভৃতি অনুষঙ্গ ইত্যাদিতে সাজিয়ে বাংলার স্মৃতি-প্রীতি-পরিবেশ ও রূপচিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। []

এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা—রং তার আশ্বিনের আলোর মতন ;
আকন্দ ফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরণ
রৌদ্রের দুপুর ভ'রে ;—বার-বার রোদ তার সুচিক্কণ চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায় ;—দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,
ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ ;
মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধুল,
কবেকার কোকিলের, জানো কি তা ? যখন মুকুন্দরাম, হায়,

লিখিতেছিলেন ব'সে দু-পহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়—থেমে-থেমে যায় ;—
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেসে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধানখেতে, আমবনে অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিলো কুয়াশা কেবল।

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'এখানে আকাশ নীল' কবিতায় বাংলার যে রূপচিত্রটি ফুটে উঠেছে তা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২. এই কবিতায় যে যে ফল, ফুল, পাখি, নদী ও মানুষের নাম আছে, সেগুলি উল্লেখ করো।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার, ছুঁয়েছে চরণ।'—কবিতার নাম কি? কবি কে? অংশটির অর্থ গুছিয়ে লেখো। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ সম্পর্কে দু-চারটি কথা লেখো।

২. 'অথবা বেহুলা একা ......কেবল।'—কোন্ কবিতা থেকে অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে? কবি কে? উদ্ধৃত অংশটির বিশদ অর্থ বুঝিয়ে লেখো।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'এখানে আকাশ নীল'—কোথায়? সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা কর।

২. 'যখন মুকুন্দরাম, হায়, লিখিতেছিলেন বসে দু-পহরে সাধের সে চণ্ডিকা-মঙ্গল'—মুকুন্দরাম কে? তিনি কোন যুগের কবি? চণ্ডিকামঙ্গল কাব্যের বিষয় কয়েকটি বাক্যে লেখো।

● ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী

১. শব্দার্থ লেখো ও বাক্যে প্রয়োগ কর: নীলাভ, হিম, গুঞ্জরণ, চরণ, গাঙুর, কুয়াশা।

২. পদ পরিবর্তন কর: আকাশ, নীল, গুঞ্জরণ, চঞ্চল, শরীর, সন্ধ্যা, অস্পষ্ট, সুচিক্কণ।

৩. অন্তত তিনটি করে প্রতিশব্দ লেখো: আকাশ, শাখা, রৌদ্র, চুল, চরণ, কোকিল, শরীর।

৪. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো: হিম, শাদা, আলো, চঞ্চল, রৌদ্র, চিক্কণ, সন্ধ্যা।

কবি : কিশোর-কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬—১৯৪৭) আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় এবং শক্তিমান কবি। কবির জন্মস্থান কলকাতা। মাত্র কুড়ি বছর বেঁচেছিলেন এই কবি। অল্প বয়সে এই ভাবী বনস্পতি যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে লোকান্তরিত হন। প্রকাশিত গ্রন্থ—ছাড়পত্র, ঘুম নেই, মিঠেকড়া ইত্যাদি। []

তাঁর কবিতা : সুকান্ত শোষিত নিপীড়িত নির্যাতিত জনগণের কবি। যেখানে অসাম্য, শোষণ, অন্যায়—সেখানেই তিনি প্রতিবাদে সোচ্চার। শোষিত সর্বহারা জনগণকে মুক্তির ডাক দিয়ে জাগিয়ে গেছেন কবি। 'রানার' কবিতাটিতে সর্বহারা শোষিত মানুষের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। শোষক শ্রেণীর হাত থেকে একদিন মুক্তি মিলবে। শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই স্বপ্ন এই আশ্চর্য জীবনধর্মী কবিতাটির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। []

রানার ছুটেছে, তাই ঝুম্‌ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে,
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে।
রানার চলেছে, রানার !
রাত্রির পথে পথে চলে—কোনো নিষেধ মানে না মানার,
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।
রানার ! রানার !
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে—
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে ;

রানার চলেছে বুঝি ভোর হয়-হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মত পিছে সরে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ—বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ।
অবাক রাতের তারারা আকাশে মিট্‌মিট্‌ করে চায়;
কেমন করে এ রানার সবেগে হরিণের মত যায়!
কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে—
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্‌ জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ, রানার, এখনো রাতের কালো।
রানার! রানার!
এ বোঝা টানার
দিন কবে শেষ হবে?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া।
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
রানার! রানার! কী হবে এ বোঝা বয়ে,
কী হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে?
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে—আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখনি, নাই দেরি নাই আর,
ছুটে চলো ছুটে চলো আরো বেগে, দুর্দম হে রানার॥ [সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

● বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১. 'রানার চলেছে, রানার!' কে চলেছে? কেন চলেছে? কোথায় চলেছে সে? রানারের পথ চলার একটি নিখুঁত বর্ণনা দাও।

২. 'রানার' কবিতাটির মধ্যে শোষিত মানুষের যে দুঃখ ও বেদনা প্রতিচিত্রিত হয়েছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নাবলী

১. 'তার জীবনের স্বপ্নের মত ·····কোণ।'—কোন্ কবির লেখা কোন্ কবিতা থেকে অংশটি নেওয়া হয়েছে? অংশটির বিশদ অর্থ লেখো।

২. 'ঘরেতে অভাব ···· ছোঁয়া।'—কোন্ কবির লেখা কোন্ কবিতার অংশ এটি? অংশটির অর্থ বুঝিয়ে লেখো।

৩. 'দেখা দেবে বুঝি প্রভাত ···· রানার।'—কোন্ কবিতা থেকে অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে? কবির নাম কি? এই অংশে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন, নিজের ভাষায় লেখো।

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'বোঝাই জাহাজ, রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে।'—'বোঝাই জাহাজ' বলতে এখানে কি বলা হয়েছে? রানার কোথায় এবং কেন চলেছে?

২. 'দস্যুর ভয় তারও চেয়ে ভয়'—দস্যুর ভয় কেন? তারও চেয়ে বেশি ভয় কিসে? কেন?

৩. 'রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?—'রাত' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? সূর্য ওঠার মধ্যে দিয়ে কি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

৪ 'সময় হয়েছে নতুন খবর আনার।'—'সময় হয়েছে' কথার অর্থ কি? 'নতুন খবর'—কিসের খবর?

৫. 'শপথের চিঠি নিয়ে চলো'—'শপথের চিঠি' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? কোথায় সেই চিঠি নিয়ে যেতে বলা হয়েছে?

৬. 'পৌঁছে দাও এ নতুন খবর অগ্রগতির 'মেলে''—অগ্রগতির 'মেল' কি? কিভাবে সেখানে 'এ নতুন খবর' পৌঁছে দেবে রানার?

৭. 'দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখনি'—কিসের 'প্রভাত'? 'দেখা দেবে'—অর্থ কি?

● **ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী**

১. শব্দার্থ লেখো ও বাক্যে প্রয়োগ কর: রানার, নিষেধ, দিগন্ত, দুর্বার, দুর্জয়, সবেগে, নির্জন, শপথ, ভীরুতা, অগ্রগতির 'মেলে', মাভৈঃ।

২ পদ পরিবর্তন কর: নিষেধ, বোঝাই, সংবাদ, দুর্জয়, কোণ, গ্রাম, ভোর, অভাব, পৃথিবী, নির্জন, দস্যু. ভীরুতা, প্রভাত, দুর্দম।

৩. সন্ধি বিচ্ছেদ কর: দিগন্ত, সংবাদ, দুর্বার, দুর্জয়, নির্জন, দুর্দম।

৪. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো: নিষেধ, স্বপ্ন, সবেগে, কালো, প্রভাত, নির্জন, নতুন।

৫. স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর: তাই ঝুমঝুম **ঘণ্টা** বাজছে রাতে। রানার চলেছে **চিঠি** আর **সংবাদে**। রানার **সবেগে** হরিণের মত যায়। কখন **সূর্য** ওঠে। আজ **ভীরুতা** পিছনে ফেলে। দেখা দেবে বুঝি **প্রভাত** এখনি।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

S8
JAG

মূল্যঃ ৮·০০টাকা